সাহাবা জীবনের আলোকময় কাহিনী

কিসরার মুকুট



নাসীম আরাফাত

কিসরার মুকুট

মাওলানা নাসীম আরাফাত

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৮৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

পঞ্চম মুদ্রণ : জুন ২০০৭ ঈসায়ী

চতুর্থ মুদ্রণ : জুন ২০০৫ ঈসায়ী

তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ঈসায়ী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০০১ ঈসায়ী

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০০ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স : রিয়াজ হায়দার

কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ : **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-00-6

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

KISRAR MUKUT

By : Maulana Nasim Arafat

Price Tk. 68.00 US $ 3.00 only

লেখকের আরয

নদী প্রবাহের মতোই মানুষের সাংস্কৃতিক প্রবাহ। আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাকার বহু উপাদানের মিশ্রনে গড়ে উঠে এক এক জাতির এক একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এক একটি কালচারাল পরিধি। তাই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপ-চেহারা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। ইহুদী-খৃষ্টানদের বেলায়ও ঠিক ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও কালচারাল পরিমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আপন আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকে।

কিন্তু এক একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নদী প্রবাহের মতোই গ্রহণ-বর্জনের অন্তহীন ধারা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এভাবে চলার পথে কখনো কোন জাতি নিজস্ব সাংস্কৃতি বর্জন করে ভিন্ন জাতির ভিন্ন সাংস্কৃতি গ্রহণ করতে থাকে। বৎসরের পর বৎসর এভাবে গ্রহণ-বর্জনের ক্রমধারা চলতে চলতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রূপ পাল্টে যায়। ভিন্ন এক মিশ্রিত সাংস্কৃতিক ধারা চলতে থাকে। আরো কিছু কাল এভাবে চলতে চলতে মানুষের জীবন প্রবাহটাই পাল্টে যায়। বোধ বিশ্বাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জাতীয় স্বকীয়তা, জাতীয় বোধ-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা হারিয়ে তখন সে জাতি অন্য জাতিতে লীন হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় শুধুমাত্র তার নামটি বাকী থাকে।

এক্ষেত্রে ইসলাম চিরন্তন ধর্ম। পরিপূর্ণ ধর্ম। এর কোন লয় নেই। ক্ষয় নেই। বিনাশ নেই। কিয়ামত পর্যন্ত এধর্মের ক্রমধারা চলতেই থাকবে। তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেন,

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

তোমরা (কার্যকলাপে, কথা বার্তায়, আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোষাকে, চাল-চলনে) পাপিষ্টদের আকৃষ্ট হয়ো না। তাদের দিকে ঝুকে পড়ো না। তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। (সূরা হুদ-১১৩)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (আহমাদ, আবূ দাউদ)

সুতরাং মুসলমান কখনো ভিন্ন জাতির অনুসৃত হতে পারে না। ভিন্ন জাতির আচার-আচরণ, চলাফেরা, বোধ-বিশ্বাস, শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহন করতে পারে না। ভিন্ন জাতির তাহযীব-তমাদ্দুন, সাংস্কৃতি ও কালচার গ্রহণ করতে পারে না। কারণ ইসলামের নিজস্ব আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ সাংস্কৃতি ও কালচার রয়েছে। যা চিরন্তন। পরিপূর্ণ। ব্যাপক। অতুলনীয়।

কিন্তু আমরা কি আমাদের সেই ইসলামী সাংস্কৃতি ও কালচারকে ধরে রাখতে পেরেছি? আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক পূর্বে এদেশের সামাজিক যে চিত্রটি মন-মুকুরে ভেসে উঠে তা কি আজ বর্তমান? অনেক পাল্টে গেছে। আকীদা-বিশ্বাসে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও আচার-আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে এদেশের প্রত্যোকটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘর থেকে প্রত্যুষে কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর আওয়ায ভেসে আসতো। কিন্তু এখন তার সম্পূর্ণ বিপরিত। কুরআনের স্থানটি দখল করে নিয়েছে হারমুনিয়াম। পূণ্যের স্থানে পাপের জয়জয়কার। আগে ছেলে মেয়েরা সকালে দল বেধে মসজিদ-মাদরাসা বা মক্তবে যেতো। আলিফ-বা দিয়ে তাদের হাতে খড়ি হতো। কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ বিপরীত। আলিফ-বা এর স্থানটি এ-বি-সি দখল করে নিয়েছে। আর মাদরাসা মক্তবের স্থানটি দখল করে নিয়েছে কিণ্ডার গার্ডেন ও চাইল্ড স্কুলগুলো।

এভাবে ব্যক্তি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যোকটি ক্ষেত্রে ইসলামী চেতনা ও কালচারকে সুপরিকল্পিত ভাবে ধবংস করে দেয়া হচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সুদীর্ঘ নীল নক্শা আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এ নীল নকশার প্রধান লক্ষ্য আমাদের অবোধ কিশোর সন্তানরা ও অবলা নারীরা। এদের বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ভিন্ন চিন্তা চেতনায়গড়ে তোলার জন্য কোটি কোটি ডলার দেদারছে ব্যয় করছে।

তাই নারীরা আজ রাস্তায় নেমে এসেছে। মিছিল মিটিংয়ে যোগ দিচ্ছে। সামাজিক রীতিনীতি ভেঙ্গে ফেলার মুখ রোচক শ্লোগান দিচ্ছে। আর কিশোর বালকদেরকে শিক্ষার নামে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে ঐ নীল নকশার আওতায় লাখ লাখ স্কুল গড়ে তুলেছে। ভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও ভিন্ন সাংস্কৃতিতে তাদেরকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এহেন ঘন কুয়াশা-আচ্ছাদিত মুহূর্তে একটি মাত্র প্রশ্ন, একটি মাত্র জিজ্ঞাসা হৃদয়কে দুমড়ে মুচড়ে কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসছে। কোথায় আজ জাতির কর্ণধাররা? কোথায় উম্মার কাণ্ডারীরা? কোথায় যুগের নকীবরা?

কিন্তু সে জন্য তো আর নিশ্চিন্তে দর্শকের গ্যালারীতে বসে থাকা যায় না। তাই আমার এ প্রয়াস-প্রচেষ্টা। শেকড় সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে রাসূলের হাতে গড়া সোনার মানুষ সাহাবীদের আদর্শে উদ্ধুদ্ধ হয়ে তাদেরই জীবনের কিছু জ্যোতির্ময় কাহিনীকে মৌলিকত্ব বজায় রেখে বর্ণাঢ্য রূপায়নে কিশোর যুবকদের হাতে উপস্থাপিত করতে প্রয়াস চালিয়েছি। এর সফলতা-ব্যর্থতা পাঠক বর্গের হাতে। তবে আমার বিশ্বাস, সাহাবীদের বিস্ময়কর ঘটনা পড়ে, তাদের দীপান্বিত জীবন চরিত অধ্যয়ন করে তারা এ নিকষ কালো অন্ধকারে জ্যোতির্ময় আদর্শের সন্ধান পাবে। ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে। সকল আগ্রাসন ও নীল নক্শার বিরুদ্ধে শির উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে। সকল ষড়যন্ত্র জাল ধূলিস্মাৎ করে বীর দর্পে এ জাতিকে ধবংসের লোমশ থাবা থেকে রক্ষা করতে পারবে।

এ পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে আমি আরব বিশ্বের খ্যাতনামা সাহিত্যিক গবেষক ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, খালিদ ইব্ন খালিদ, আইয ইব্ন আবদুল্লাহ ও ভারত বর্ষের মহান বুযুর্গ দার্শনিক আল্লামা ইউসূফ কান্দালভী (র)এর নিকট অপরিমিত ঋণে আবদ্ধ। তাই হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে আমি তাঁদের রচিত যথাক্রমে সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, রিজালুন হাওলার রাসূল, সুয়ারুম মিন সিয়ারিস সাহাবা ও হায়াতুস সাহাবা থেকে যথেষ্ট

সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছি। আগ্রহ উদ্দীপনা পেয়েছি। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌছান।

আর সবশেষে যার কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয় তিনি হলেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পুস্তকটি প্রকাশনা ও প্রচারণার দায়িত্বভার কাধেঁ তুলে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত যুগপৎ আনন্দিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে বরকতময় দীর্ঘায়ু দান করুন। আর আমাদের সবাইকে হিদায়াতের পথে কবূল করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বিনীত
নাসীম আরাফাত
জামিয়া শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

সূচীপত্র

কিসরার মুকুট

নাসীম আরাফাত

গায়েবী দুধ

চারণভূমি। বিস্তৃত চারণভূমি। মক্কার অদূরে তৃণঘাসে ভরা এই চারণভূমিতে হাজারো পশু চরে বেড়ায়। দলে দলে রাখাল বালকেরা এখানে পশু চরাতে আসে। বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তখন রাখাল। মক্কার সর্দার উক্‌বার মেষ চরানো তার কাজ। সেই কাকডাকা ভোরে মেষগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আবার পড়ন্ত বিকেলে মেষগুলো তাড়াতে তাড়াতে মক্কায় ফিরে আসে। সারাদিন রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে মেষ চরায়। মাঝে মধ্যে বুনো ঝোপের আড়ালে একটু আধটু বিশ্রাম নেয়। এই তার জীবন।

সেদিন আকাশে ছিলো গনগনে উত্তাপ। মরুর সূর্য যেন আগুনের কুণ্ডলী। যেন দারুণ ক্ষিপ্ত, অসম্ভব ক্রুদ্ধ। নির্দ্বিধায় মুঠি মুঠি আগুন ছড়াচ্ছে মরুর বুকে। গোটা প্রকৃতি তখন আগুনে পুড়ছে। তাই দারুন ক্লান্তি, দারুন অবসাদ নুয়ে পড়ছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের দেহ। রৌদ্রতাপে তার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। অবশেষে টিকতে না পেরে ক্লান্ত পা দু'টি টেনে টেনে একটি ঝোপের আড়ালে বসলো। একটু ছায়ায় বসলো। বেশ ভাল লাগছে তার। একটু সুখ সুখ অনুভব করছে। চোখে তার উদাস উদাস চাউনি। অজানা উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক তার দৃষ্টি ঘুরে ফিরছে। যেন কাউকে খুঁজছে। কাউকে তালাশ করছে।

ইতিমধ্যে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো দু'জন লোকের উপর। তারা এদিকেই আসছে। ঠিক তারই দিকে যেন এগিয়ে আসছে। চোখে মুখে তাদের আতঙ্কের ছায়া। তবুও অপূর্ব অপরূপ। যেন স্বর্গীয় আলোর দূত, যেন স্নেহ মমতার মূর্ত প্রতীক। একজন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অপরজন তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী। অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রিয়ভাজন হযরত আবু বকর (রাঃ)। চুপি চুপি তাঁরা দাওয়াতের কাজে

বেরিয়ে ছিলেন। দ্বীনের প্রচার করছিলেন। এখন আবার মক্কায় ফিরে যাচ্ছেন।

পায়ে পায়ে তাঁরা এগিয়ে এলেন। আরো এগিয়ে এলেন। একেবারে ইবনে মাসউদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেলফুলে অপূর্ব শোভা আর শুভ্রতা ছড়িয়ে আছে রাসূলের মুখমণ্ডলে। তিনি বললেন, রৌদ্রে গা পুড়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে প্রায় কাঠ। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। একটু দুধ দিবে কি?

রাসূলের মিষ্টি মধুর কথাগুলো মোহময় হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বাতাসের কোলে পিঠে। দারুন স্বাদ তাঁর কণ্ঠস্বরে। দারুন মজা তাঁর বচনভঙ্গীতে। রাসূলের কথা শুনে রাখাল বালক ইবনে মাসউদ দারুন বিস্মিত হলো। একেবারে চমকে উঠলো। তারপর ভেবে চিন্তে বিনীত কণ্ঠে বললো, মেষ চরানোই আমার কাজ। আমি কি দুধ দিতে পারি?

অত্যন্ত সরল। দারুন সাদাসিধে। অথচ বিশ্বস্ততায় ভরা তার উত্তর শুনে রাসূলের মনের আকাশে খুশির পায়রাগুলো উড়ে উড়ে ডিগবাজি খেলো। ভাবলেন, এতটুকুন ছেলে; অথচ কতো বিশ্বস্ততায় ভরা তার কথা। বললেন, বেশ তাহলে এখনো দুধ হয়নি এমন একটি ছাগল ছানা এনে দাও।

রাসূলের কথায় কৌতূহলের ডানা ঝাপটানি শুরু হলো ইবনে মাসউদের অন্তরে। এমন ছাগল ছানা দিয়ে কী হবে?! সে কী আর দুধ দিবে!? অসম্ভব! তাহলে কি হবে? কি করবেন তিনি তা দিয়ে? আচ্ছা, এনেই দেই না। দেখি, কি করেন তিনি তা দিয়ে?

নির্নিমেষ পলকশূন্য ইবনে মাসউদের চোখ। সে চোখে গভীর দৃষ্টি। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। দেখছেন আজব ব্যাপার। অপূর্ব কাণ্ড। রাসূল ছাগল ছানাটি কাছে টেনে নিয়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। ছাগলটি একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। একটুও নড়াচড়া নেই। যেন পাথরের মূর্তি। তারপর বাটে হাত রাখলেন। বিড় বিড় করে কি যেন পড়লেন। ব্যাস! অবাক কাণ্ড। এক অলৌকিক ব্যাপার। দু' চোখ বিশ্বাস না করলেও রাখাল ইবনে মাসউদ তা স্বচক্ষে দেখলো। দুধের বাট দু'টো ধীরগতিতে

দুধে ভরে গেলো। একেবারে টইটম্বুর। কানায় কানায় ভরা। তাড়াতাড়ি আবু বকর (রা) একটি পাথরের বাটি নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে দুধ দোহন করলেন। সাদা ধবধবে দুধ। উষ্ণ ফেনিল দুধ। কী তার সুবাস! কী দারুন তার স্বাদ!!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন। পরিতৃপ্ত হলেন। আবু বকর (রা) পান করলেন। পরিতৃপ্ত হলেন। রাখাল ইবনে মাসউদও বাদ পড়লো না। তাকেও দিলেন। সে পান করলো। আকণ্ঠ পান করলো। তবুও মন তার তৃপ্ত হলো না। ইস্ কী তার স্বাদ! কী তার মজা! যেন এখনো তার মজা জিহবা ও ওষ্ঠাধরে লেগে আছে। জীবনে কতো বকরীর দুধ পান করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অথচ এমন স্বাদ সে কখনো পায় নি। এমন মজা সে কখনো আস্বাদন করে নি।

বিস্ময়াভিভূত, হতবুদ্ধি ইবনে মাসউদ। অপলক দৃষ্টিতে সে রাসূলের দিকে চেয়ে রইলো। মাথায় তার হাজারো চিন্তা, হাজারো ফিকির আর বিচিত্র ভাবনা। পায়ে পায়ে সে রাসূলের আরো কাছে এগিয়ে এলো। আবেগভরা তার কণ্ঠ। অনুসন্ধিৎসু তার মন। বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে ঐ যাদুময় কথাগুলো শিখিয়ে দিবেন কি?

বালক ইবনে মাসউদের প্রশ্নে রাসূল দারুন খুশি হলেন। ভাবলেন, ছেলেটি তো দারুন বুদ্ধিমান। তীক্ষ্ণ মেধাবী। কালে সে শিক্ষিত হবে। জ্ঞানের আলোকমালায় পৃথিবী উজ্জ্বল করবে। তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। স্নেহভরা হাতটি মাথায় রাখলেন। ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি দারুন বুদ্ধিমান ছেলে। একদিন জ্ঞানের আলোকে গোটা পৃথিবীকে তুমি আলোকিত করবে।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* রিজালুন হাওলার রাসূল, ১৯৬ পৃষ্ঠা ঃ দারুল জ্বীল, লেবানন।

পালাবদল

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সকল শক্তির আধার। মানুষকে জীবন দান করেন। মৃত্যু দান করেন। এ বিশাল বিশ্বচরাচরের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক ও মালিক। আর হাতে গড়া ঐ পাথুরে মূর্তিগুলোর কোন শক্তি নেই। কোন ক্ষমতা নেই। এরা কোন ভাল-মন্দের মালিক নয়। এর ক্ষমতাও রাখে না।

ব্যস, এই চিরন্তন সত্য কথাগুলোর কারণেই সব অঘটন শুরু হলো। চির বিশ্বস্ত আল-আমীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু হয়ে গেলো মক্কার লোকেরা। রাসূলকে গালমন্দ করে। পাগল বলে বেড়ায়। নানাভাবে কষ্ট দেয়।

মক্কায় যখন এই চরম উত্তপ্ত পরিস্থিতি ঠিক তখন খাব্বাব ইবনে আরাত নামের এক কামারের নিকট সত্যের এই আহবান পৌছলো। এই আহবানকে সে উপেক্ষা করতে পারলো না। গোপনে গোপনে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো।

কিন্তু যত গোপনই হোক অবশেষে তা আর গোপন রইলো না। এক কান, দু' কান হতে হতে গোটা মক্কায় তা রাষ্ট্র হয়ে গেলো। খাব্বাব (রা)এর মনিব উম্মে আনমার ও তার ভাই সিবার কানেও খবরটি পৌছলো। সংবাদটি শুনেই তারা বিস্ময়ে থ। ক্রোধে অগ্নিশর্মা। দাঁতে দাঁত পিষে বললো, এ্যাঁ—এতো বড় দুঃসাহস এই পুচকে গোলামটির!! পাক দেবদেবীর নামে গালমন্দ আর মুহাম্মদের অন্ধ অনুকরণ!! না, এটা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

সিবা এক দঙ্গল বখাটে ছেলে নিয়ে ছুটে এলো খাব্বাব (রা)এর জীর্ণ কুটিরে। হাপড়ে তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। লাল টক্‌টকে লৌহ শলাকা আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছেন খাব্বাব ইবনে আরাত (রা)। ক্ষুরধার তলোয়ার বানাচ্ছেন। ঠিক তখন সিবা এসে সামনে দাঁড়ালো। উগ্রমূর্তি। হিংস্র হিংস্র ভাব। বললো, মানুষ বলে তুমি খুব বুদ্ধিমান। বর্ষিয়ানদের দূরদর্শিতা আর প্রজ্ঞাবানদের অভিজ্ঞতা তুমি রাখ। কিন্তু;

তোমাকে নিয়ে এখন মক্কার লোকেরা এসব কী বলাবলি করছে?

সিবার কথায় দারুন বিস্ময়ভাব ঝরে পড়লো খাব্বাব (রা)এর কণ্ঠ চিরে। বললো, আচ্ছা, তাই নাকি, কী শুনছো ভাই সিবা?

অগ্নিঝরা সিবার কণ্ঠ। বললেন, শুনলাম তুমি বিধর্মী হয়ে গেছো। আবূ তালেবের ঐ ভাতিজার পিছু ধরেছো।

দারুন প্রশান্ত খাব্বাব (রা)এর কণ্ঠ। কোন ভয় নেই। কোন উৎকণ্ঠা নেই। বললেন, ছি, এসব কী বলছো! ভাই সিবা। আমি বিধর্মী হবো কেন? আমি তো চিরন্তন সত্যধর্ম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আল্লাহই তো আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আমাদের জীবন মরণ সবই তো তাঁর হাতে। মৃত্যুর পর আমরা সেই আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো। তাই আমি বিশ্বাস করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

খাব্বাব (রা)এর কথায় সিবার সারা গায়ে আগুন ধরে গেলো। নিশপিশ করে উঠলো তার মুষ্টিবদ্ধ হাত। প্রচণ্ড ঘুষির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো খাব্বার (রা)এর উপর। দাঙ্গল ছেলেগুলোও আর দাঁড়িয়ে নেই। লাথি ঘুষি আর আঘাতের পর আঘাত করে চললো বিরামহীনভাবে। লৌহ শলাকার আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে পড়লো খাব্বাব (রা)এর গোটা দেহ। টলতে টলতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

নারী হৃদয় সর্বদা কোমল, পেলব। নিষ্ঠুরতা আর নির্মমতার কোন লেশ থাকে না তাতে। কিন্তু মক্কার এই উম্মে আনমার তার সম্পূর্ণ উল্টো মেরুতে। মুসলিম নাম শুনলেই সে ক্রোধে আগুন। ঝালাপালা শুরু হয় তার গোটা শরীরে। তাই সিবা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচার ও নির্যাতনে সে দারুন মুগ্ধ। অত্যন্ত আনন্দিত।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই খাব্বাব (রা)এর নিকট এলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিবেন। সহমর্মিতা প্রকাশ করবেন। এছাড়া তখন আর রাসূলের করারই বা কী আছে? উম্মে আনমার তা শুনলো। ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো। ফনাধর নাগিনী আর কি। ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। একদল পাষণ্ড নিয়ে নিজেই খাব্বাব (রা)এর দোকানে ছুটে এলো। হাপড় থেকে তুলে নিলো লাল টক্‌টকে লৌহ শলাকা।

তারপর তা ঠেসে ধরলো তার মাথায়।

উহ্, আহ্, বাঁচাও! বাঁচাও! একটি করুণ আর্তচিৎকার তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এলো। তারপর তাঁর গোটা দেহ কুঁচকে গেলো। সংজ্ঞা হারিয়ে তিনি ধরার ধূলিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এভাবে নির্যাতনের পর নির্যাতন চলতে লাগলো। অবশেষে খাব্বাব (রা) একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়লেন। মনকে তিনি আর কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছিলেন না। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে রাসূলের দরবারে এলেন। আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনী বললেন। রাসূল সব কিছু শুনলেন। হৃদয়ে তাঁর আবেগ আর বেদনার মরু ঝড় বইলো। চোখ দিয়েও অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়লো। হাত তুলে রোরুদ্য কণ্ঠে দু'আ করলেন—আল্লাহুম্মা উনসুর খাব্বাবান। হে আল্লাহ! হে আমার মাবুদ! খাব্বাবকে সাহায্য কর। খাব্বাবকে সহায়তা কর।

রাসূলের দু'আ ঊর্ধ্বলোকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বিফলে গেলো না। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে গজব নেমে এলো। ভয়াবহ লোমহর্ষক সে গজব। উম্মে আনমারের হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হলো। সে কী ব্যথা! ব্যথা যতই বাড়তে লাগলো উম্মে আনমারের আর্তচিৎকার আর কান্না ততই বাড়তে লাগলো। সময়ের তালে তালে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। উম্মে আনমারের চিৎকার ও কান্নাও বেড়ে চললো। সবাই হতবাক। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রখ্যাত ওঝা এলো। নামকরা কবিরাজ এলো। দক্ষ চিকিৎসক এলো। চিকিৎসা চললো। কিন্তু উপশমের কোন লক্ষণ নেই।

এদিকে উম্মে আনমারের আর্তচিৎকার ধীরে ধীরে ভিন্নরূপ ধারণ করলো। তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হতে হতে অবিকল পাগলা কুকুরের কণ্ঠ স্বরে রূপায়িত হলো। এবার সবাই স্তম্ভিত। স্তব্ধ। হতাশ। আল্লাহর লীলা বুঝা দায়। কিছুই তারা বুঝলো না। এদিকে সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দুপুর উম্মে আনমার শুধু ঘেউ ঘেউ করছে। মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে এই আজগুবি সংবাদ বহু দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। এলো নূতন ওঝা। এলো নূতন কবিরাজ। নিরলস, নিরন্তর চিকিৎসা চললো। কিন্তু ফলাফল শূন্য। যেই সেই।

সবশেষে বয়োবৃদ্ধ এক চিকিৎসক এলো। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তার দেহ। আদ্যোপান্ত সব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপর বিজ্ঞের ন্যায় মাথা দুলিয়ে বললো, হাঁ, একটি মাত্র পন্থা আছে। একটি মাত্র পথ্য আছে। হয়তো উপশম হবে। হয়তো আরোগ্য লাভ করবে। তবে তা অত্যন্ত করুণ। অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আগ্রহভরা কণ্ঠে সবাই বললো, আচ্ছা, বলুন না সেই চিকিৎসা। আমরা তাই করবো। বৃদ্ধ বললো, তার মাথায় দাগ দিতে হবে। উপস্থিত সবার চোখেমুখে বিস্ময়। বললো, সে আবার কি!? বৃদ্ধ বললো, লাল টক্‌টকে লৌহ শলাকা তার মাথায় ঠেসে ধরতে হবে। জখমি হবে। পুড়ে যাবে। তারপর আশা করা যায় রুগিনী সুস্থ হবে। আরোগ্য লাভ করবে।

ব্যাস! যেই কথা সেই কাজ। কিন্তু দাগ দেয়া, একি যেন তেন কাজ! ভাবতেই তো শরীর শিউরে উঠে। তাহলে কে এই গুরুদায়িত্ব পালন করবে? একজন বললো, আরে, এর জন্য কি আবার চিন্তা করতে হবে? ঐ তো আমাদের গোলাম খাব্বাব আছে। সেই তো আগুনের খেলায় দারুন পারদর্শী। তাকেই এই কাজের জিম্মা দেয়া হোক।

দেখ। আল্লাহর কুদরত দেখ। আল্লাহর শক্তি দেখ। কী হতে কি হয়ে গেলো! একেবারে পালাবদল। আল্লাহ যেন নিজ কুদরতের হাতে উম্মে আনমারের ঐ উত্তপ্ত লাল টক্‌টকে লৌহ শলাকাটি খাব্বাব (রা)এর হাতে তুলে দিলেন। আর বললেন, হে নির্যাতিত নিপীড়িত খাব্বাব! এবার তোমার পালা। এবার তুমি শুরু কর। জালিমের অহংকার চিরতরে দূর করে দাও। তোমার শরীরে যেভাবে উত্তপ্ত লৌহশলাকা ঠেসে ধরতো, তুমি এবার তা তার মাথায় ঠেসে ধর।

মক্কার লোকেরা এই হৃদয়বিদারক ঘটনা, এই অলৌকিক পালাবদল দু' চক্ষে দেখলো। অবলোকন করলো অনেকের হৃদয়ে তা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। অনেকের চোখের তারায় হিদায়াতের আলোও ঝলমলিয়ে উঠলো। কিন্তু কাফিরদের চির অন্ধকারাচ্ছান্ন অন্তরে হিদায়াতের আলো জ্বললো না। গোঁড়ামী, একগুঁয়েমী আর অন্ধ বিশ্বাস ছেড়ে তারা আলোর রাজতোরণে এসে দাঁড়ালো না।

বুসরার বাজারে

শামের পথ ধরে একটি কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্য কাফেলা। সারি সারি উট বোঝাই করে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। কাফেলাটি মক্কা থেকে শামের বুসরা শহরে যাচ্ছে। বৎসরে একবার গ্রীষ্মকালে মক্কার লোকেরা শামে যায়। ব্যবসা–বাণিজ্য করে। আবার মাতৃভূমি মক্কায় ফিরে আসে। শীতকালে আবার ইয়ামেনে যায়। ব্যবসা–বাণিজ্য করে। আবার ফিরে আসে। এভাবে মক্কার লোকদের জীবনযাত্রা বেশ ভালই যাচ্ছিলো।

বুসরা শহরে পৌছেই ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় মেতে উঠলো। প্রায়ই তারা শামের এ শহরে আসে। তাই এর গলি–ঘুপচি, রাস্তাঘাট সবকিছুই তাদের নখদর্পণে। দেখার বা জানার মতো তাদের কিছুই নেই। কিন্তু ত্বলহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এক ব্যতিক্রমধর্মী যুবক ছেলে। দেহের মতো মনেও তার যৌবনের জোয়ার। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এলেও মন তার দুরন্ত চঞ্চল। বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, উপস্থিত বুদ্ধিতে তার যথেষ্ট খ্যাতি। আর বাকচাতুর্যে সে সবার শীর্ষে। মিষ্টি মধুর কথার আবেশে সহজেই ক্রেতাকে বশ করা তার নিত্য ব্যাপার। বুসরার বিরাট বাজারে ঘুরে ঘুরে সে ব্যবসা করছিলো। ক্রয় বিক্রয় করছিলো নানা মতের, নানা জাতের, নানা প্রকৃতির মানুষের সাথে মিশছিলো আর বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখছিলো।

ঠিক তখন এক অবাক কাণ্ড ঘটে গেলো। যা তার জীবনযাত্রার গতিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলো। তার জীবনে সৃষ্টি করলো এক অকল্পনীয় বিপ্লব। ত্বলহার মুখেই আমরা এখন সে কাহিনীটি শুনবো।

আমি ত্বলহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ। আমি তখন বুসরার বাজারে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করছি। ক্রয় বিক্রয় করছি। হঠাৎ আমার দৃষ্টি এক ছোট্ট জটলার উপর গিয়ে পড়লো। অনুসন্ধিৎসু মন আমাকে তাড়িয়ে সে দিকেই নিয়ে গেলো। গিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। দেখি,

বর্ষীয়ান এক পাদ্রী। শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের আভা তার গোটা চেহারা জুড়ে। দেখতে ভারী চমৎকার। মায়াময় চেহারা। সবার দারুন শ্রদ্ধেয়। অত্যন্ত আকুলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলছেন, হে ব্যবসায়ী ভাইয়েরা! এ মওসুমের ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মাঝে কি কোন মক্কার লোক আছে? হারামের অধিবাসী আছে? পাদ্রীর কথায় আমার মনে আনন্দ ও বিস্ময়তার বিদ্যুৎ খেলে গেলো। আমি নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না। অগ্রসর হয়ে বললাম, হাঁ, এই তো আমি হারামের অধিবাসী। মক্কার লোক। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি আহমদ নামে কেউ আবির্ভূত হয়েছেন?

ঃ কোন্ আহমদ?

ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র। এমাসই তাঁর আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের মাস। তিনি নবীকুল শিরোমণি। শেষ নবী। তোমাদের হারাম থেকে বেরিয়ে তিনি কালো পোড়া পাথুরে ভূমির মাঝে সবুজ শ্যামল খর্জুর বৃক্ষে ভরা স্বচ্ছ নির্মল পানি সমৃদ্ধ এক অঞ্চলে হিজরত করবেন।

হে যুবক! আর বিলম্ব করো না। এক্ষুণি মক্কায় ফিরে যাও। এ আল্লাহর মহা নেয়ামত। এক্ষুণি ফিরে যাও। তাঁর আনুগত্য কর।

পাদ্রীর কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করলো। আমি আর বিলম্ব করলাম না। ব্যবসা গুটিয়ে মক্কার পানে রওনা হলাম। ফেরার পথে পাদ্রীর কথাগুলো বার বার আমার কানে গুঞ্জন তুলে আমাকে অস্থির করে ফেলতো। নানা চিন্তার উকিঝুকি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। যেন কুদরত আমাকে কোন অজানা রহস্যালোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মক্কায় পৌছেই ব্যগ্রকণ্ঠে পরিজনকে মক্কার খবরাখবর জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, আচ্ছা, ইতিমধ্যে কি মক্কায় বিস্ময়কর কিছু ঘটেছে? তারা বললো, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর কথা বলছো? সে তো নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করেছে। আর আবূ কোহাফার পুত্র আবূ বকর তাকে অন্ধের মত বিশ্বাস করছে। তার অনুসরণ করছে।

আমার হৃদয়ে তখন দারুন আলোড়ন। চরম উত্তেজনা। উচ্ছাস আর ব্যাকুলতায় আমি অধীর। ভাবলাম, আবূ বকর তো বন্ধুবান্ধব আর স্বজনদের মাঝে অত্যন্ত প্রিয়। দারুন কোমল তাঁর হৃদয়। যেমন চরিত্রবান তেমনি সদা ন্যায় ও সত্যে অবিচল। সুতরাং প্রথমেই গিয়ে তাঁকে বললাম, শুনেছি, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নবুয়তের দাবী করেছে আর আপনি তার অনুসরণ করছেন?

তিনি বললেন, হাঁ। তারপর আমাকে রাসূলের বিভিন্ন ঘটনা শুনালেন। ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন। আমি তখন তাকে পাদ্রীর কাহিনী বললে তিনি অত্যন্ত হতবাক হলেন। বললেন, চলো, তাঁর নিকট যাই, তোমার ঘটনাটি তুমি তাঁকে শুনাবে।

আমি আর বিলম্ব করলাম না। আবূ বকর (রা)এর সাথে রাসূলের নিকট গিয়ে পাদ্রীর ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন। তাঁর চেহারায় তখন নির্মল অপূর্ব এক প্রফুল্লতা ফুটে উঠলো। তিনি আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শুনালেন। ইহ ও পরকালের সুসংবাদ দিলেন। ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে পূর্ব থেকেই আমার হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মোচিত করে রেখেছিলেন। আমি তখন আমার হৃদয়ের কোষে কোষে, বিন্দুতে বিন্দুতে নূরের জ্যোতি অনুভব করতে লাগলাম। আমি তখন ব্যাকুল আত্মহারা। হৃদয়ে আমার মরু ঝড়ের তাণ্ডব। সে ঝড়ের প্রচণ্ড প্রবাহে আমার হৃদয়ের সকল কালিমা দূর হয়ে গেলো। আমি কালিমা পাঠ করে মুসলমান হলাম। আমি ছিলাম ইসলামী ইতিহাসে চতুর্থ মুসলমান।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ ত্বলহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* রিজালুন হাওলার রাসূল, ৩৭৪ পৃষ্ঠা ঃ দারুল জ্বীল, লেবানন।

রাসূল যখন ব্যস্ত

জন্মান্ধ। তাই আলো ঝলমল এই সুন্দর পৃথিবী তিনি দেখেন নি। দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য আর আলোর স্বাদ তিনি উপভোগ করেন নি। চির অন্ধকার সমুদ্রেই জন্মলগ্ন থেকে ডুবে আছেন। তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)।

চোখের জ্যোতি হারালেও অন্তরের জ্যোতি তিনি হারান নি। অন্তরের জ্যোতিতে, হৃদয়ের আলোতে তিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় আর হক-বাতিল চিহ্নিত করতে পারতেন। নির্ণয় করতে পারতেন। তাই জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই মূর্তিপূজাকে বাতিল, মূর্খতা ও নিঃসাড় মনে করতেন। মদ-জুয়া, ছিনতাই-রাহাজানি ইত্যাকার অপরাধকে ঘৃণা করতেন। অন্তরে অন্তরে এক সুন্দর শান্তিময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন ও সুকুমার বৃত্তির বিজয় ঘোষণা করতেন।

কিন্তু পাপের সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মক্কার লোকেরা এই চির অন্ধ মানুষটির কথা শুনতো না। বাচাল বলে উড়িয়ে দিতো। ঠাট্টা-মশকরা করতো।

এই অন্ধ মানুষটি যখন রাসূলের দাওয়াত পেলেন, ইসলামের শাশ্বত বাণী শুনলেন তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। শত সহস্র আনন্দের নির্ঝরমালা তার শুষ্ক, চৌচির হৃদয়ে বয়ে গেলো। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। বহু দিনের পিপাসার্ত হৃদয়টি তাঁর পরিতৃপ্ত হলো। বহু দিন পর পৃথিবীতে তিনি একটু প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ব্যাকুলতা আর চঞ্চলতা বহু গুণ বেড়ে গেলো। কুরআনের বাণী মুখস্ত করতে তিনি পাগলপারা। রাসূলের মুখের অমূল্য বাণী শুনতে তিনি আত্মহারা। বার বার রাসূলের মজলিসে ছুটে যান। নিরবে বসে বসে রাসূলের বাণী শুনেন। অন্ধ চোখ দু'টি দিয়ে তাঁর অশ্রুর ধারা বয়ে যায়। কিছু না বুঝলেই সাথে সাথে তার ওষ্ঠাধর কেঁপে

উঠে। বিনয় নম্র ভরা কণ্ঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন। রাসূল তাতে বিরক্ত হননা। বরং তৃপ্তির এক উজ্জ্বল আভা তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে থাকে।

রাসূল তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। মুহাব্বত করেন। তাঁর অন্তরের আবেগ, অনুপ্রেরণা ও আলোড়ন অন্তর দিয়ে অনুভব করেন। রাসূলের কারণে সাহাবীরাও তাঁকে মুহাব্বত করেন। তা'জীম করেন। সম্মান করেন আর ভালবাসেন।

সেদিন রাসূলের অন্তরে আনন্দের ঢেউ বইছিলো। একসাথে একই মজলিসে ইতিপূর্বে আর কখনো এতগুলো মক্কার সর্দারদের তিনি পান নি। তাই হৃদয়ে তাঁর আনন্দ উপচে পড়েছে। আশা তাঁর আকাশের নীলিমা ছাড়িয়ে গেছে। এ মজলিসে উপস্থিত উৎবা ইবনে রবীয়া, শাইবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহেল, উমাইয়া, ওলীদ সহ আরো অনেকে। এরা ইসলাম গ্রহণ করলেই কিল্লা ফতেহ। কোন কষ্ট থাকবে না। কোন ক্লেশ থাকবে না। কোন বাধা বিপত্তি থাকবে না। দাওয়াতের কাজ, ধর্ম প্রচারের কাজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে গোটা মরু আরবে ছড়িয়ে পড়বে। তাই রাসূলের মনে আশার তরঙ্গমালা পাক খেয়ে খেয়ে উঠছিলো। হৃদয় সাগরে আকুলতা আর ব্যাকুলতার প্রচণ্ড বান ডেকেছিলো।

ঠিক তখন সেই অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) এক সমুদ্র আশা নিয়ে রাসূলের মজলিসে উপস্থিত হলেন। রাসূলকে পাওয়ার আনন্দ তাঁর চেহারা থেকে উপচে পড়ছিলো। কুরআনের বাণী শিখবেন। রাসূলের কথা শুনবেন। এই তাঁর উদ্দেশ্য। এই তাঁর মাকসুদ। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, যে জ্ঞান দিয়েছেন, আমাকে তা শিখিয়ে দিন।

আজকে, এই সময়ে, এই মুহূর্তে, এমনি অবস্থায় তাঁর আগমনে রাসূলের মনে কোন আনন্দের ঢেউ উঠলো না। বরং বিরক্তির ঢেউ খেলে গেলো। মুখের রেখায় রেখায় মলিন ভাব ছড়িয়ে পড়লো। তিনি তাঁর উত্তর দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কোরাইশ সর্দারদের সাথে আলোচনায় মগ্ন হলেন।

রাসূল খুব আবেগের সাথে, অত্যন্ত আস্থার সাথে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইসলামের মহিমার কথা বুঝালেন। আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার বাণী শুনালেন। মূর্তিপূজার অসারতার কথা খুলে খুলে বললেন।

আলোচনা প্রবাহ চলতে চলতে এক সময় থেমে গেলো। কিন্তু জমার খাতায় এক বিরাট শূন্য। কেউ মুসলমান হলো না। রাসূলের কথা শুনলো না। কুসংস্কারে ওদের হৃদয় মরে গেছে। অন্ধকার ওদের অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। তাই ওরা আলো সহ্য করতে পারে না। সত্যকে অম্লান বদনে মেনে নিতে পারে না।

রাসূলের হৃদয়ে বেদনার পরশ ছুঁয়ে গেলো। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাবেন যাবেন অবস্থা। ঠিক তখনই তাঁর হৃদয় মোহনীয় এক সুরের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। তিনি তখন অস্থির। সপ্ত আকাশ ফুঁড়ে নেমে এলো জিবরাইল ফেরেস্তা। সাথে ওহী। আল্লাহর বাণী।

অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)এর আকুলতা ব্যাকুলতা, আর জানার আগ্রহ ও উদ্দীপনা আল্লাহ তাআলার খুব ভাল লেগেছিলো। অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিলো। তাই অম্লমধুর তিরস্কার করে কুরআন অবতীর্ণ করলেন।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى. أَنْ جَاءَهُ الأَعْمٰى. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى. وَهُوَ يَخْشٰى. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.

তিনি ভ্রু কুঁচকালেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে। তিনি কি জানেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে অথবা উপদেশ গ্রহণ করবে? ফলে তার উপকার হবে।

আর যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তার দায়–দায়িত্ব আপনার নেই। আর যে ভীত অবস্থায় আপনার নিকট দৌড়ে এলো আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনো এরূপ করবেন না। এটা উপদেশ বাণী। (সূরা আবাছা ১–১১)

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুন সতর্ক থাকতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) মজলিসে এলেই তাঁকে খুব সম্মান করতেন। সমীহ করতেন। তাঁর প্রয়োজন মেটাতেন। আর বলতেন, ইনি হলেন আমার সেই সাহাবী যাঁর প্রতি অমনোযোগী হওয়ার কারণে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছিলেন। অম্ল মধুর তিরস্কার করেছিলেন।

সফলতার সন্ধানে

দিগন্ত বিস্তৃত বালু-সাগরের মাঝে বসন্তের শ্যামলিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট নগরী মক্কা। খর্জুর কুঞ্জের মাঝে মাঝে মানুষের ছোট ছোট আবাস। কাবা গৃহকে কেন্দ্র করে মূর্তির পূজা-পার্বণে আর শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্য ভ্রমণে মক্কাবাসীদের জীবনযাত্রা মোটামুটি ছন্দবদ্ধ ভাবেই কেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু কয়েকদিন যাবত আর সে স্বস্তি নেই। সেই স্বাচ্ছন্দ নেই। ছন্দবদ্ধ জীবনের কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে। কানাঘুষা চলছে এখানে-সেখানে। এ ওকে টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে কী যেন বলছে। অজানা আশঙ্কায় সবাই যেন আতঙ্কিত।

ঐ তো ছোট একটি জটলা। উত্তেজনায় টগ্‌বগ্‌ করছে সবাই। সর্দার গোছের লোকটা হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। চলো ওখানে যাই।

ঃ শুনেছো মুহাম্মদের কাণ্ড! সা'আদকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার দলে ভেড়ালো আর ছেলের দুখে-শোকে এখন তার মা মরণাপন্ন। ক্ষুৎপিপাসায় বেচারী একেবারে হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে।

ঃ আহা! বেচারী লাত-উজ্জার নামে কতো কঠিন শপথ করে ফেললো! সা'আদ স্বধর্মে ফিরে না এলে নাকি আর খাবার ছুঁবে না।

ঃ কী শুরু করলো আবূ তালিবের এই ভাতিজাটি! মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে একী অনাসৃষ্টি বাঁধিয়ে দিলো?

ঃ সময় থাকতে এখনই ওকে রুখতে হবে। নইলে বিপদ আরো ঘনীভূত হবে।

ঃ এভাবে প্রস্তাবের ঝড় তুলে লাভ নেই। চল সা'আদকে নিয়ে তার অসুস্থ, অনাহারক্লিষ্ট, মরণোন্মুখ মায়ের কাছে যাই। দেখবে, সা'আদ মায়ের হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার দেহটি দেখে স্থির থাকতে পারবে না। মাতৃভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়কে সে ধরে রাখতে পারবে না। মায়ের পদতলে, মায়ের শয্যাপাশে সে অবশ্যই লুটিয়ে পড়বে।

সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) মায়ের শয্যাপাশে উপস্থিত। চারপাশে ঘিরে আছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আর বন্ধু-বান্ধবরা। মায়ের মুখপানে সা'আদের স্থির দৃষ্টি। আহ্ দুধে ধোয়া সেই বিমল মুখে ইতিমধ্যে কালি পড়ে গেছে। বিমর্ষ মলিন হাড় জিরজিরে বিধ্বস্ত চেহারা। কোঠরাগত চোখ। প্রাণের স্পন্দনে বুকটি থেকে থেকে উঠানামা করছে।

কিন্তু সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) নির্বিকার। ভাবাবেগের কোন উদ্রেক নেই। পলকহীন স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন মায়ের স্নেহমাখা মুখপানে। কী করবেন তিনি? কীইবা করার আছে তাঁর? যে হৃদয় ঈমানের স্নিগ্ধ আলোর পরশে আলোকিত হয়েছে, যে হৃদয় তার জিন্দেগীর মাকসুদ খুঁজে পেয়েছে, সে হৃদয় আর কখনো শিরক-কুফরের নিকষ কালো অন্ধকারে ফিরে যেতে পারে না।

তাই সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)এর হৃদয় আজ অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত অবিচল ও দৃঢ়। কুফরীর সাথে তাঁর আজ কোন আপোস নেই। বাতিলের সাথে তার কোন বোঝাপড়া নেই। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি আরো এগিয়ে গেলেন। মায়ের কানে ঝুঁকে পড়লেন। নিম্নকণ্ঠে বললেন, মা! আপনি এ কী করছেন? যদি আপনার একশত প্রাণ হয় আর আমার জন্য একটির পর একটি করে সবগুলো নিঃশেষ করে দিন। তবুও আমি মুহূর্তের জন্যও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবো না। এবার ভেবে দেখুন। ইচ্ছে হলে পানাহার করুন, অন্যথায় বিরত থাকুন।

ঈমানের প্রতি সা'আদ (রাঃ)এর দৃঢ়তা ও অবিচলতার কারণে আল্লাহ তাআলা মুগ্ধ হলেন। দারুণ সন্তুষ্ট হলেন। আর দেরী নয়। সাথে সাথে রাসূলের কাছে ওহী পাঠালেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন পিতামাতার প্রতি

সদ্ব্যবহার করে। তবে তারা যদি আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মেনো না।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

ইনি হলেন রাসূলের মাতুল, প্রিয় সাহাবী সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)। রাসূল যার বীরত্ব, সাহসিকতা, ঐকান্তিকতা আর পরহেযগারীতে গর্ব করে বলতেন, "ইনি আমার মামা। তোমাদের কারো এমন মামা থাকলে দেখাও দেখি।"

সত্যানুসন্ধিৎসু সাহাবীরা এমনিভাবে সকল মায়া-মমতা, ধনসম্পদ, বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা ইহলোক ও পরলোকে তাদের সফলতা ও কামিয়াবী দিয়েছিলেন। আজকের এই অশান্ত পৃথিবীতে আমাদেরও তাই করতে হবে। তবেই আসবে শান্তি, নিরাপত্তা আর সফলতা।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, চতুর্থ খণ্ড ঃ সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* রিজালুন হাওলার রাসূল, ১২৪ পৃষ্ঠা, দারুল জীল, লেবানন।

রাসূল যখন মদীনায়

হুসাইন ইবনে সালাম। মদীনার ইহুদীদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও অবিসংবাদিত এক ব্যক্তিত্ব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাজীম করে। সবার হৃদয়জুড়ে তাঁর মুহাব্বত। তাঁর ভালবাসা। কারণ, তিনি একজন খাঁটি মানুষ। তাকওয়া-পরহেযগারী, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাকার সকল সুকুমার বৃত্তিতে তিনি এক উজ্জ্বল আলোকময় নিদর্শন।

মদীনার এক নিরিবিলি এলাকায় একেবারে শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করতেন। সময়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একভাগে গির্জায় গিয়ে ইবাদত বন্দেগী করতেন। উপদেশ দিতেন। আরেকভাগে হালাল উপার্জনে ও খেজুর বাগানের পরিচর্যায় কাটাতেন। আরেক ভাগে গভীর মনোযোগ সহকারে তাওরাত পাঠ করতেন। তাই ধর্মীয় জ্ঞানে তিনি ছিলেন মদীনায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত।

তাওরাত পাঠ করতে করতে যখন তিনি মক্কায় সর্বশেষ রাসূলের আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ বাণী পাঠ করতেন, তখন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তেন। চিন্তার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকতেন। প্রতিশ্রুত এই রাসূলের গুণাবলী ও নিদর্শনসমূহ তন্ন তন্ন করে খুঁজতেন। খুঁজতে খুঁজতে যখনই বুঝতেন, এই রাসূল মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করবেন এবং বাকী জীবন মদীনায়ই অবস্থান করবেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। কিন্তু পরক্ষণেই এক বিষাদময় কালোছায়া তাঁর চেহারায়, তাঁর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তো। হায়, আমার জীবন কী এতো দীর্ঘ হবে! আমি কী তাঁর সাক্ষাৎ পাবো! নানা চিন্তার ভেলায় ভাসতে ভাসতে সহসা তাঁর কণ্ঠ চিরে এক কঠিন প্রত্যয় বেরিয়ে আসতো। হাঁ, তাঁর সাক্ষাতের সৌভাগ্য নছীব হলে নিশ্চয় আমিই সর্বপ্রথম তাঁর উপর ঈমান আনবো। তাঁর অনুগামী হবো।

মক্কায় রাসূলের আবির্ভাবের সংবাদ মদীনায় পৌছতেই তাঁর অন্তরে

অস্থিরতার দোলা শুরু হলো। তিনি খুটে খুটে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত জানতেন। অবশেষে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত রাসূল, সেই মহামানব যার মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করবে। যারপর আর কোন রাসূল বা নবী দুনিয়াতে আসবে না। হুসাইন ইবনে সালাম তাঁর এই বিশ্বাসটি হৃদয় গভীরে গোপন রাখলেন। কারো সাথে এ ব্যাপারে কোন কথাবার্তা বা আলোচনা করলেন না।

হিজরতের পর রাসূল যখন কোবায় অবস্থান করছিলেন তখন এক ব্যক্তি মদীনার পল্লিতে পল্লিতে রাসূলের আগমন বার্তা ঘোষণা করে গেলো। ঠিক তখন হুসাইন ইবনে সালাম খেজুর বৃক্ষের মাথায় ছিলেন। তিনি তা পরিচর্যা করছিলেন আর তার ফুফু খালেদা বিনেত হারিছ গাছের নীচে বসেছিলো। বার্তাটি তাঁর কানে পৌছতেই তিনি আনন্দের আতিশয্যে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। অবস্থা দেখে গাছের নীচে বসা তাঁর ফুফু দারুণ বিস্মিত হলো। বললো, আরে তুমি তো দেখছি মূছা ইবনে ইমরান এলেও এতো আনন্দিত হতে না। কারণ কি? হুসাইন ইবনে সালাম বললেন, ফুফু! বিশ্বাস করুন, তিনি মূসা ইবনে ইমরানের ভাই। তাঁরই ধর্ম নিয়ে তিনি এসেছেন। তাঁর কথা শুনে ততোধিক বিস্মিত হয়ে তাঁর ফুফু বললো, আচ্ছা, তবে কি তিনি সেই রাসূল, যার আবির্ভাবের কথা তুমি আমাদের বার বার বলতে? হুসাইন ইবনে সালাম বললেন, হাঁ, তিনিই সেই রাসূল।

এরপর আর হুসাইন ইবনে সালাম দেরী করলেন না। সাথে সাথে রাসূলের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দরজায় তখন বহু মানুষের ভিড়। তাই বলে তিনি ফেরার পাত্র নন। একটু একটু করে একেবারে রাসূলের পাশে গিয়ে পৌছলেন। রাসূলের মুখ নিঃসৃত প্রথম যে বাণী তিনি শুনলেন তা হলো, হে লোকসকল! তোমরা একে অপরকে বেশী বেশী সালাম দাও। মানুষকে আহার দাও। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। আর নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর।

রাসূলকে তিনি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। চোখভরে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেলো যে,

এ মুখ কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। তারপর আরো নিকটবর্তী হয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, তোমার নাম কি?

ঃ হুসাইন ইবনে সালাম।

ঃ না, বরং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।

ঃ হাঁ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ করে বলছি, আজকের পর এই নামটিই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় নাম হবে।

তারপর তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। স্ত্রী পরিজন ও বাড়ির সবাইকে একত্রিত করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি তাদের বললেন, আমি তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছো তা প্রকাশ করবে না। তিনি আবার রাসূলের মজলিসে ফিরে এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদী জাতি অত্যন্ত কলহ প্রিয়। ডাহা মিথ্যাবাদী। তাই আমার মন চায়, আপনি তাদের নেতৃস্থানীয়দের ডেকে আনবেন আর আমাকে পাশেই এক কামরায় লুকিয়ে রাখবেন। তারপর তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানে না। জানলে আমাকে গালমন্দ করবে। মিথ্যা অপবাদ দিবে।

রাসূল তাঁর কথা শুনে একটু চিন্তার জগতে ঘুরে এলেন। তারপর মাথা দুলিয়ে বললেন, হাঁ, তাদেরকে ডাকছি। তারপর আমাকে পাশ্ববর্তী এক কামরায় রেখে নেতৃস্থানীয় ইহুদীদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে রাসূল তাদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করলেন। তাওরাতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের বুঝালেন। ঈমানের অনেক কথা বললেন। কিন্তু তারা রাসূলের কথা মেনে নিলো না। বরং উল্টো তারা রাসূলের সাথে তর্কে লিপ্ত হলো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, আমি তখন আড়ালে বসে সব শুনছিলাম। পরিশেষে নিরাশ হয়ে রাসূল তাদের বললেন, আচ্ছা তোমাদের নিকট হুসাইন ইবনে সালাম কেমন ব্যক্তি?

ঃ আমাদের মনিব। মনিবের পুত্র। একজন বিজ্ঞ আলেম। বিজ্ঞ আলেমের পুত্র।

ঃ আচ্ছা, তিনি মুসলমান হলে তোমরা কি মুসলমান হবে?

ঃ অসম্ভব, তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না।

ঠিক তখন আমি বেরিয়ে এলাম। বললাম, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা মেনে নাও। আল্লাহর কসম, তোমরা তো জান, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর নামধাম, গুণাবলী ও পরিচয় সবকিছুই তাওরাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শুনে নাও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।

ইহুদীরা তখন রেগে আগুন। একেবারে অগ্নিশর্মা। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কসম, তুমি নিকৃষ্ট ব্যক্তি। নিকৃষ্ট ব্যক্তির পুত্র। তুমি অজ্ঞ। অজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র। এভাবে আমাকে বিভিন্ন অপবাদে জর্জরিত করে তারা যে যার পথে চলে গেলো।

তারপর আমি রাসূলকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলিনি যে, ইহুদীরা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। ডাহা মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)এর কথার কোন উত্তর দিলেন না। শুধু বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ষষ্ঠ খণ্ড ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* ছুয়ারুম মিন সিয়ারিস সাহাবা, ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দারু ইবনে খুজাইমা, রিয়াদ।

দেবতার দশা

জীবনের বেলাভূমিতে এসে পৌঁছেছে। নিঃশেষ হয়ে এসেছে প্রাণ প্রাচুর্য। স্তিমিত হয়ে এসেছে জীবন প্রদীপের সলতে। তবুও পূজা প্রীতিতে একটুও ভাটা পড়ে নি। সেই কাকডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে। তারপর কখন যে ফিরে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। গভীর রাতের অন্ধকারে নিঝুম নিরালায় একাকী এ অভিসার, প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের চেয়ে বহু বেশি মোহনীয়। সারাদিন তার একই চিন্তা, একই কল্পনা—কখন নিশাগমন করবে, কখন ত্রি-সংসারের মায়া ছেড়ে দেবতার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে নিজের সকল অস্তিত্ব, সকল আমিত্ব বিলীন করে অপূর্ব এক তৃষ্ণায় পরিতৃপ্ত হবে। যেন গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ্দুরে তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকা খণ্ড এক পশলা বৃষ্টির অপেক্ষায় অধীর।

দেবতা পাগল এই লোকটি ছিলো বনু সালেমা গোত্রের এক বিশিষ্ট নেতা। নাম আমর ইবনে জমূহ। মদীনার ঘরে ঘরে মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে তার খুব সুনাম। কিন্তু তার ছেলে মুয়ায ইসলামের মোহনীয় হাতছানিতে বিমুগ্ধ হয়ে ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর এ পরিবারে শুরু হলো আলো-আঁধার আর সত্য-মিথ্যার চিরদ্বন্দ্ব। আলোচনা, পর্যালোচনা, বাকবিতণ্ডা অবশেষে বচসা পর্যন্ত হলো। কিন্তু আমর স্বীয় মতে অনড়। একেবারে অবিচল। একটুও নড়লো না স্বীয় ধর্মবিশ্বাস থেকে।

এদিকে ইসলামের আলো মদীনার ঘরে ঘরে দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। জমাট বাঁধা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমানের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো মানুষের হৃদয়াকাশ।

চারদিক চির সত্যের পরশে আলোকিত, উদ্ভাসিত। ঘনক্লেদ আর আবিলতার স্থানে স্নিগ্ধমধুর মায়াময় দীপ্তির ছড়াছড়ি।

ইতিমধ্যে আমর ইবনে জমূহ-এর বাল্যবন্ধু অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারাও আমরকে অনেক বোঝালো। মূর্তির অসারতা, অক্ষমতা আর জড়তার কথা শোনালো। কিন্তু আমর নাছোড়বান্দা। কিছুতেই সে পিতৃপুরুষের ধর্ম ছাড়লো না। পিতার এই অনমনীয়তায় মুয়ায (রা) দারুন ব্যাকুল। অত্যন্ত বিষন্ন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালালো। কিভাবে তাঁর পিতা সত্যের দিশা পাবে? কিভাবে সত্যের আলোয় তার হৃদয় চির উদ্ভাসিত হবে? এই চিন্তায় সে দারুন অস্থির। কিন্তু আশার কলিগুলো একে একে ঝরেই যাচ্ছে। কি করা? অবশেষে বন্ধু মুয়ায ইবনে জাবালের কথা মনে পড়লো। বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে সে সমবয়সীদের মাঝে শীর্ষে। তাঁরই সাথে পরামর্শ করা দরকার। পরামর্শ হলো। এক চমৎকার ফন্দি আঁটলেন তাঁরা।

পরদিন প্রত্যুষে আমর ছুটলো দেবমন্দিরে। কিন্তু প্রবেশ করেই তার আক্কেল-গুড়ুম। একী! দেবতা কোথায়? শিউরে উঠলো তার সারা শরীর। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো মন্দিরের চারদিক। কিন্তু নেই। কোথাও নেই। তবে গেলো কোথায়? ভয়-ভীতি আর উত্তেজনা তার চোখেমুখে। ভয়ার্ত ডাকাডাকিতে হুলস্থূল পড়ে গেলো। সকলে এসে জড়ো হলো। তারপর দিগ্বিদিক ছুটলো দেবতার সন্ধানে। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এলো, অদূরেই এক পূতিগন্ধময় স্থানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমর হন্যে হয়ে ছুটে গেলো। দেবতার অপছায়া বুঝি পড়েছে তার উপর। তাই উলু ধ্বনিতে মুখরিত করে তুললো চারদিক। তুলে আনলো দেবতাকে।

বাড়িতে এনে আতর গোলাপ আর সুগন্ধিতে সুবাসিত করলো। তারপর দেবতাকে তার বেদীতে অধিষ্ঠিত করলো। কিন্তু এখানেই কী শেষ! পর পর কয়েকদিন ঘটলো এই আজব ঘটনা। ফলে তিক্ত বিরক্ত হয়ে একদিন আমর ক্ষেপে উঠলো দেবতার উপর। তরবারী উঁচিয়ে খানিকটা শাসিয়ে দিলো দেবতাকে। বললো, আবার যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারিস, তবে তোর আর রক্ষা নেই।

পরদিন প্রত্যুষে আবার সেই একই ঘটনা। সকল শাসন উপেক্ষা করে দেবতা উধাও। এবার আমর দারুন বিরক্ত হলো। অবাধ্য পা দু'টোকে

টেনে টেনে অগ্রসর হলো পূতিগন্ধময় স্থানের দিকে। আজ দেবতার দশা আরো গুরুতর। মৃত, গলিত এক কুকুরের সাথে শক্ত রশি দিয়ে বন্ধুত্বের চিরবন্ধন রচনা করে যেন পাশাপাশি শুয়ে আছে।

থমকে দাঁড়ালো আমর। নিরুপায় এক আস্ফালন তার বুকে মাথা কুটছে। ক্ষণকাল অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো। তারপর দূর দিগন্তের নীলিমায় তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো। আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চিন্তায় মুষড়ে পড়লো। তবে কি পাথুরে এই দেবতা সত্যই নির্জীব? সত্যই নিষ্প্রাণ? আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও কি তার নেই? মুয়ায যা বলছে, বাল্যবন্ধুরা যা বলছে, তবে কি তাই চিরসত্য? পিতৃপুরুষদের ধর্মাচারে কি তাহলে কোনই বাস্তবতা নেই?

আহা! কতো নিশি নির্জনে গভীর নিস্তব্ধতায় একটু সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় কত তপস্যা, কত কাতর নিবেদন এই দেবতার পতদলে করেছি। আজ দেখছি, সেই দেবতাই কতো অসহায়! কতো অক্ষম! তবে কি আমি সারাজীবন মিথ্যা, অবান্তর আর ধূম্রজালের পিছনে ছুটেছি? মরীচিকার পিছনে দৌড়েছি? অসহায়তার চাপা বেদনা তাকে ক্রমশই অস্থির করে তুললো।

ইতিমধ্যে কয়েকজন বাল্যবন্ধু এগিয়ে এলো। কাঁধে হাত রেখে বললো, বন্ধু আর কতোদিন এ মিথ্যার পিছনে, এ মরীচিকার পিছনে ছুটবে। এসো আমাদের সাথে। এসো সত্যের পথে। চলো যাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তিনি আল্লাহর রাসূল। প্রেরিত মহা পুরুষ। সেখানেই চিরসত্যের সন্ধান পাবে।

ইতিমধ্যে তার হৃদয় থেকে সকল অন্ধকার, সকল মিথ্যা বিশ্বাস তিরোহিত হয়ে গেছে। ইসলামের সত্যতা, কমনীয়তা আর বাস্তবতার বিকশিত হয়েছে। আমর ইবনে জমূহ আর দেরী করলো না। সত্যের সন্ধ্যানে ছুটলো রাসূলের দরবারে।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।* রিজালুন হওলার রাসূল, ৫০৬ পৃষ্ঠা, দারুল জীল, লেবানন।

ক্ষুধার্ত এক সাহাবী

সরীসৃপের মতো একটি পথ মদীনার বস্তিগুলোর আশপাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে দূর মরুর বুকে গিয়ে মিশেছে। এ পথে চলাফেরা করে রাসূলের সাহাবীরা। গমনাগমন করেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ধূলি ঝড় উড়িয়ে এ পথেই ছুটে যায় মুজাহিদদের কাফেলা।

নিরব নিস্তব্ধ জনশূন্য এ পথের পাশে এসে দাঁড়ালেন এক সাহাবী। ফ্যাকাশে চেহারা। কোঠরাগত চক্ষু। শীর্ণ দেহ। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তিনি কাতর। শুষ্ক পাপড়ির মত ওষ্ঠাধর শুকিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে ইতিউতি করছেন। মনে হয় যেনো কারো অপেক্ষা করছেন। কিন্তু শূন্যপথে কাউকে দেখছেন না। তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে মাঝে মধ্যে বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন।

দেখলেন, দূর থেকে এক মানবমূর্তি এ পথ ধরেই এগিয়ে আসছে। ধীর তার গতি। বিষন্ন চিন্তাক্লিষ্ট তার চেহারা। দীপ্ত ললাট। তিনি হলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। রাসূলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গারে সওরের একান্ত সাথী। সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান।

ক্ষুধার্ত সাহাবী তাঁকে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। ক্ষুধার কথা কী ভাবে মুখ ফুটে বলবেন? মুহূর্তে তার মনোবল উবে গেলো। লজ্জা, জড়তা এসে তার বাকশক্তিকে অচল করে দিলো। ইতিমধ্যে আরো কাছে এগিয়ে এলেন আবূ বকর (রা)। উপায়ান্তর না দেখে ভাবলেন, কিছু একটা জিজ্ঞেস করি। কথার তালে তালে বাড়ি পর্যন্ত পৌছা যাবে। তারপর কি তিনি আর না খাইয়ে ছাড়বেন? আবূ বকর (রা) নিকটে এলে শুষ্ক কণ্ঠে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) ছিলেন অন্যমনস্ক। সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আবার সে পথেই চলে গেলেন। পথিক সাহাবী হতভম্ব হয়ে পথেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্ষুধার জ্বালা আরো তীব্র হতে লাগলো। চারদিকে সব ঝাপসা ঝাপসা মনে হতে লাগলো। তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো কেউ আসবে। কিছুক্ষণ পর আরেকজন এগিয়ে এলেন। তিনি হলেন উমর ইবনে খাত্তাব (রা)। তেজোদৃপ্ত গতিময় পদক্ষেপ। তড়িঘড়ি করে হয়তো কোথাও যাচ্ছেন।

উমর (রা)–কে দেখে ক্ষুধার্ত সাহাবীর মনে আবারো সেই লজ্জা, সেই জড়তা এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। কি বলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। উমর (রা) কাছে এগিয়ে এলে তাঁকেও কিছু জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু উমর (রা) কোন কিছু চিন্তা না করে উত্তর দিয়ে চলে গেলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পথচারী সাহাবী পথেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

হতাশায়, নিস্ফল পদক্ষেপে আর ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় সেই সাহাবী দিশেহারা হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তবুও আশার ক্ষীণ আলোক রশ্মিতে ভরসা করে আবারো সেই পথে এসে দাঁড়ালেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, এবার কেউ এলে আর মুখ ফুটে কিছু বলতে লজ্জা করবেন না। অসহ্য এ জঠর জ্বালা থেকে তাকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে।

কিছুক্ষণ পর দূর থেকে এগিয়ে এলো আরেক মানব মূর্তি। দীপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। অন্তর্ভেদী চাউনি। ঈষৎ উন্নত নাসিকা। ঘনকৃষ্ণ চুল। পুষ্পিত শতদলের স্নিগ্ধ পরাগের নিটোল হাসি তাঁর ওষ্ঠাধরে। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরো কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। সাহাবীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মধুর হাসলেন। অন্তর্ভেদী চক্ষু দিয়ে সবকিছু দেখলেন। সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে তাঁর হৃদয়ের কথা অনুধাবন করলেন। তারপর গভীর স্নেহের স্বরে বললেন, আবূ হুরায়রা! আমার সাথে এসো।

আমি রাসূলের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ছোট ছোট কুটিরগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। রাসূল অন্দরে প্রবেশ করলেন। তারপর আমাকে ভিতরে ডাকলেন। গিয়ে দেখি, রাসূলের সামনে দুধেভরা ছোট্ট একটি পেয়ালা। ভাবলাম, এ দুধটুকুই বুঝি আমার ভাগ্যে লেখা ছিলো। কিন্তু রাসূল আমাকে দেখেই

বললেন, যাও আবূ হুরায়রা! মসজিদ থেকে আহলুস সুফ্‌ফার সাহাবীদের ডেকে আনো।

রাসূলের কথা শুনে আমার হৃদয় আকাশে মুহূর্তে বিষাদের বিদ্যুৎ খেলে গেলো। ভাবলাম, সত্তরজন মানুষ আর মাত্র এক পেয়ালা দুধ। হায়রে! এক ফোঁটাও বুঝি ভাগ্যে জুটবে না। কিন্তু রাসূলের আদেশ শিরোধার্য। তাই তাদের ডেকে আনলাম। তারপর রাসূল আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা! সবাইকে পান করাও। আমি তো দারুন বিস্মিত। ভাবলাম, হায়রে কপাল! এতো ইন্‌তেজার, এত প্রতীক্ষার পরও বুঝি ক্ষুধার্তই থেকে যাবো। অব্যক্ত–চিন্তায় ঝাপটায় মুষড়ে পড়লো আমার মন।

কিন্তু রাসূলের নির্দেশ তো পালন করতেই হবে। তাই পেয়ালটি তুলে নিলাম। পান করাতে লাগলাম। একের পর এক সবাইকে পান করালাম। কিন্তু আশ্চর্য! প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে পান করে ভরা পেয়ালাটিই আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলো।

সবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেয়ালাটি আমার হাত থেকে তুলে নিলেন। আমার দিকে ফিরে তাকালেন। মায়া–মমতা আর অসীম স্নেহে ভরা রাসূলের সেই অপূর্ব চাউনি। তারপর মধুর কণ্ঠে বললেন, আবূ হুরায়রা! এবার তোমার আর আমার পালা। নাও, পান কর। আমি পান করলাম। রাসূল বললেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম। রাসূল বললেন, আরো পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যথেষ্ট পান করেছি, আর পারছি না।

আমার কথায় রাসূল মিষ্টি মধুর হাসলেন। তারপর এক চুমুকে পেয়ালার দুধটুকু নিঃশেষ করে ফেললেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ আবু হুরায়রা (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* হায়াতুস সাহাবা, প্রথম খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব আল আরবী, লেবানন।

জান্নাতের চির সাথী হতে চাই

রবীয়া ইবনে কা'ব। মদীনার এক যুবক ছেলে। নবযৌবনের জোয়ার লেগেছে তার গায়। প্রাণ প্রাচুর্যে টইটুম্বুর তার হৃদয়। আকাশের নীলিমা ছাড়িয়ে গেছে তার আশা আকাঙ্ক্ষা। জীবনে বহু দূরে যাবে। অনেক কিছু করবে। খ্যাতিমান সুপুরুষ হবে। ইত্যাদি বহু তার কামনা। বহু তার আশা। এগুলোকে বাস্তবায়িত করতে যখন জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো ঠিক তখনই কাকতালীয় ভাবে রাসূলের সাথে তার দেখা হয়ে গেলো। আর অমনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো।

রবীয়া (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলকে দেখলাম, তাঁর অমিয় বাণী শুনলাম। মনের অজান্তে তাঁর ভালবাসা আমার শরীরের কোষে কোষে মিশে গেলো। রক্তের কণিকায় কণিকায় ছড়িয়ে পড়লো। আমি অধীর চঞ্চল হয়ে পড়লাম। রাসূলকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারি না। রাসূলকে না দেখলে মন আমার স্থির হয় না। তাঁর সান্নিধ্য আমার হৃদয় জুড়ে শান্তির কোমল পরশ বুলিয়ে দেয়।

একদিন আমার বিবেক আমাকে ডেকে বললো, ছি–ছি, রবীয়া! তুমি তো এখনো রাসূল থেকে বহু দূরে। যাও, এখনই তাঁর নিকট যাও। নিজেকে তাঁর খিদমতে, তাঁর সেবায় সঁপে দাও। তিনি যদি কবুল করেন তবে তো মহাসৌভাগ্য। ইহকাল ও পরকালের সব কামিয়াবী তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। যাও, এক্ষুণি যাও। বিবেকের তিরস্কারে অস্থির হয়ে রাসূলের দরবারে ছুটে এলাম। মনের ব্যাকুলতা, অস্থিরতা আর আকুতির কথা খুলে খুলে রাসূলকে বললাম। রাসূল তা শুনে খুব খুশী হলেন। মুগ্ধ হলেন। শিশির ধোয়া স্বচ্ছ সুন্দর বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর ওষ্ঠাধরে।

সেদিন থেকে রবীয়া রাসূলের খাদেম। রাসূলের খিদমত করা, আর রাসূলের সেবা করাই তাঁর কাজ। রাসূল যেখানে যান রবীয়া (রা)ও

সেখানে যান। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তিনি তা এগিয়ে দেন। সারাদিন রাসূলের সেবায়, রাসূলের খেদমতে কাটিয়ে দেন। এশার পর রাসূল বিছানায় গেলে রবীয়া (রা) চলে যান।

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। তারপর হঠাৎ আমার বিবেক আবার কষাঘাত শুরু করলো। আরে রবীয়া! তুমি তো এখনো রাসূলের সার্বক্ষণিক খাদেম হতে পারলে না। রাসূলকে রেখে রাতে কোথায় চলে যাও? এটা বড় অন্যায়, বড় দুর্ভাগ্য। সেদিন থেকে আমি রাতে কোথাও যেতাম না। রাসূলের গৃহের দরজায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতাম। খিদমতের আশায় বুক বেঁধে পড়ে থাকতাম। রাতে রাসূলকে ভিন্ন অবস্থায় দেখতাম। কখনো নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন। কখনো ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে সূরা ফাতেহা বার বার পড়তে থাকতেন। আর কপোল বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যেতো। আবার কখনো 'ছামি আল্লাহু লিমান হামিদা' পড়তে পড়তে নিশিরাত হয়ে যেতো। এমনিভাবে রাসূলের খিদমতে আমার দিনগুলো বেশ আনন্দেই যাচ্ছিলো।

একদিন দেখি রাসূলের চেহারা আনন্দে ঝিলমিল করছে। দারুন সুন্দর, অত্যন্ত অপরূপ সে দৃশ্য। হাতের ইশারায় তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। মায়া মায়া আবেগ ভরা তাঁর কণ্ঠ। বললেন, হে রবীয়া! তুমি আজ কি চাও? যা চাবে তাই দেবো। রাসূলের আবেগ ভরা কথায় আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার চিন্তাশক্তি বিকল হয়ে গেলো। কী চাইবো? কী বলবো? এই ছোট্ট প্রশ্নবোধক চিহ্নটি আমার দু'চোখে ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করলো। আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না। অগত্যা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটু সময় দিন। চিন্তা করবো।

রাসূলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, বেশ, তাই কর। তখন আমার অবস্থা দারুন অসচ্ছল। অত্যন্ত কষ্টদায়ক। দরিদ্র, বিত্তহীন মুসলমানদের সাথে মসজিদে নববীতে পড়ে থাকতাম। ছদকার কিছু এলে রাসূল তা আমাদেরকে দিতেন। আমরা তা খেতাম। আর হাদিয়া কিছু এলেও প্রায়ই তাই করতেন। এভাবে কষ্টেসৃষ্টে আমাদের দিন কাটতো। তাই নফস এবার কচ্ছপের মতো তার কুৎসিত মাথাটি বের করে বললো,

আরে রবীয়া! এই তো মহাসুযোগ। রাসূল থেকে দুনিয়ার কিছু সম্পদ চেয়ে নাও। সারাজীবন সুখে থাকতে পারবে। কোন কষ্ট থাকবে না। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে ছন্দময় জীবন যাপন করবে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার বিবেক তীব্র তিরস্কার করলো। ছি—ছি, ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার মোহে তুমি পড়ে গেলে। শোন, রিযিকের জিম্মাদার আল্লাহ। তিনি তা বন্টন করে রেখেছেন। সুতরাং রাসূলের কাছে পরকালের কামিয়াবীর দু'আ চাও। নফস আর বিবেকের এই আলো–আঁধারের দোলায় আমি বিবেককেই প্রাধান্য দিলাম। ইহকালের পরিবর্তে পরকালকেই বেছে নিলাম।

তারপর ধীরপদক্ষেপে রাসূলের নিকট এলাম। রাসূল আমাকে দেখেই হেসে ফেললেন। মিষ্টি মধুর নির্মল সেই হাসি। নিখুঁত সুন্দর নিটোল সেই হাসি। আমার হৃদয়ে এবার সাহসের আনাগোনা। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার চিরসাথী হতে চাই।

আমার আবদার শুনে রাসূল অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। দারুন বিস্মিত হলেন। বললেন, তোমাকে এ কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? বললাম, কেউ না। তবে আমার বিবেক বলেছে, আমি যেন আপনার কাছে পরকালের কিছু চেয়ে নেই। রাসূল বললেন, রবীয়া! এছাড়া অন্য কিছু কি চাবে? আমার কণ্ঠ তখন অত্যন্ত দৃঢ়। দারুন মজবুত। বললাম, না, তা হয় না। এছাড়া আর কিছুই আমি চাই না।

রাসূল তখন বেশ তন্ময় হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভাবনার জগতে যেন হারিয়ে গেলেন। তারপর তিনি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, বেশ, তাহলে বেশী বেশী সিজদার মাধ্যমে আমাকে তোমার আশা বাস্তবায়নে সাহায্য কর।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড ঃ রবীয়া ইবনে কা'ব (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* ছুয়ারুম মিন ছিয়ারিস সাহাবা, ২১১ পৃষ্ঠা, দারু ইবনে হুজাইমা, রিয়াদ।

যেভাবে বিয়ে হলো

রাসূলের ভালবাসা, রাসূলের মুহাব্বত রবীয়া ইবনে কা'ব (রাঃ)এর হৃদয়ের পরতে পরতে মিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। এখন রাসূলই তার জান। রাসূলই তার প্রাণ। রাসূলের খিদমতে সারাদিন কাটিয়ে দেন। কি সকাল, কি দুপুর, কি সন্ধ্যা, কি রাত। সর্বদা রাসূলের পাশেই থাকেন। ক্ষণিকের তরেও তাঁর মন রাসূল থেকে দূরে থাকতে চায় না।

রবীয়া (রা) বলেন, এভাবে দিনগুলো বেশ ভালই যাচ্ছিলো। এরই মধ্যে একদিন রাসূল আমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে তখন নির্মল ঈষৎ হাসির ঝিলিক। বললেন, রবীয়া! তুমি কি বিয়ে থা করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খিদমত থেকে আমাকে বিমুখ রাখবে এমন কিছু করতে আমি পছন্দ করি না। তদুপরি আমার কাছে অর্থকড়িও নাই যা থেকে মোহর দিবো। ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবো। আমার কথা শুনে রাসূল নিরব হয়ে গেলেন। আর কিছু বললেন না।

এর কিছুদিন পর রাসূল আবার আমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে তখন সেই অপূর্ব নির্মল হাসির ঝিলিক। বললেন, রবীয়া! তুমি কি বিয়ে করবে না? আমি তখন পূর্বের ন্যায় একই উত্তর দিলাম। কিন্তু তারপর থেকে আমার মনে এক অভূতপূর্ব অস্থিরতা বিরাজ করতে লাগলো। একটু একাকী হলেই মনের মাঝে এক অশান্তি দাপাদাপি শুরু করে। সারা মন জুড়ে এক ধিক্কার ধ্বনি বেজে চলে। ছি-ছি-ছি, রবীয়া! তুমি এ কী করলে? রাসূল তো তোমার দ্বীন-দুনিয়া সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তাহলে কেন তোমার এই বিমুখতা? কেন এই অস্বীকৃতি? এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে আমার মন অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বললো, হাঁ, এরপর যদি রাসূল এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন তবে আর বিমুখতা

নয়। আর অস্বীকৃতি নয়।

এর কয়েক দিন পরই রাসূল আমাকে আবার ডাকলেন। বললেন, রবীয়া! তুমি কি বিয়ে থা করবে না? আমি তখন এমনই একটি সময়ের, একটি মুহূর্তের অপেক্ষায়ই ছিলাম। তাই আর দেরী করলাম না। বিনীত কণ্ঠে বললাম, কিন্তু আমার মত নিঃস্ব বিত্তহীন যুবকের হাতে কি কেউ তার প্রাণপ্রিয় কন্যাকে তুলে দিবে? মুখে তখন যাই বললাম; কিন্তু আমার কণ্ঠে তখন অদ্ভুত নির্ভরশীলতা ও চরম আস্থা বিরাজমান ছিলো।

আমার উত্তর শুনে রাসূল কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কপালে যেন চিন্তার কয়েকটি কুঞ্চন রেখা দেখা দিলো। তাঁর চিন্তাশক্তি তখন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেড়াতে লাগলো মদীনার ঘরে ঘরে, কবীলায় কবীলায়। তারপর আবার তা ফিরে এলো। এবার রাসূলের ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির একটু ঝিলিক খেলে গেলো। বললেন, যাও, অমুক বংশে গিয়ে তাদের বল, রাসূল তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমার সাথে তোমাদের অমুক মেয়েকে বিয়ে দাও।

রাসূলের কথা শুনে আমি লজ্জায় একেবারে মরে গেলাম। ভাবাবেগের চূড়া থেকে ধীরে ধীরে বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে নেমে এলাম। বুদ্ধিসুদ্ধি যেন গুলিয়ে যায় যায়। কিন্তু কী করবো? রাসূলের নির্দেশ তো মানতেই হবে। বাস্তবায়িত করতেই হবে। ফলে একরাশ লজ্জার ডালি মাথায় নিয়ে আশার আলোতে দোল খেতে খেতে সেই কবীলায় গিয়ে পৌছলাম। বললাম, রাসূল আমায় পাঠিয়েছেন, যেন আপনারা আপনাদের অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেন।

চরম বিস্ময়, অত্যন্ত হতবুদ্ধিতার ভাব ফুটে উঠলো তাদের চোখে মুখে। তারা যেন থতমত খেয়ে গেলো। বিস্ময়ের এই ধাক্কা সইতে না পেরে বললো, আচ্ছা, অমুক মেয়ে! আমি বললাম, হাঁ। আমার কণ্ঠের স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতায় তারা যেন সম্বিত ফিরে পেলো। বিস্ময়তায় ভরা তাদের কণ্ঠস্বর এবার মিষ্টি মধুর হয়ে উঠলো। বললো, আল্লাহর রাসূলকে অশেষ ধন্যবাদ আর তাঁর প্রতিনিধিকেও অশেষ ধন্যবাদ। ইনশা আল্লাহ, রাসূলের প্রতিনিধি তাঁর অভিলাষ পূরণ না করে

ফিরে যাবে না। তারপর বিলম্ব না করে তারা আমার বিয়ের আয়োজন করলো। একেবারে সাদামাঠা অনাড়ম্বর ভাবেই বিয়ে হয়ে গেলো।

বিয়ের পর আমি রাসূলের নিকট এলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক শ্রেষ্ঠ–সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট থেকে ফিরে এসেছি। তারা আমাকে বিশ্বাস করেছে। স্বাগত জানিয়েছে আর আমার সাথে তাদের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন মোহরের কী ব্যবস্থা করবো?

রাসূল আমার কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। তারপর আমার গোত্র বনু আসলামের সর্দার বুরাইদা ইবনে খছীবকে ডেকে পাঠালেন। বুরাইদা এলে রাসূল তাকে বললেন, হে বুরাইদা! তুমি রবীয়ার বিয়ের মোহরের ব্যবস্থা করে দাও। এক দানা স্বর্ণের ব্যবস্থা কর। এভাবে নিশ্চিন্তে মোহরের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। তারপর রাসূল আমাকে ডেকে বললেন, যাও, এ স্বর্ণটুকু নিয়ে শ্বশুরালয়ে যাও। তাদের বল, এ স্বর্ণটুকু তার মোহর। আমি তাদের নিকট পুনরায় এলাম ও স্বর্ণটুকু তাদের দিলাম। তারা সন্তুষ্ট চিত্তেই তা গ্রহণ করলো। বললো, বেশ হয়েছে। চমৎকার হয়েছে। এরপর আমি রাসূলের নিকট ফিরে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবার আমি আর দেখি নি। মোহর একেবারে নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলো। অত্যন্ত মুগ্ধ হলো।

কিছুদিন এমনিই কেটে গেলো। আমার কণ্ঠে তখন এক বিষন্ন আবদারের সুর বেজে উঠলো। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এবার বৌভাতের ব্যবস্থা কিভাবে করবো? রাসূল তখন আবার বুরাইদা (রা)কে ডেকে বললেন, বুরাইদা! তুমি তার বৌভাতের জন্য একটি দুম্বার ব্যবস্থা কর। আর সবকিছুর ব্যবস্থা আমি করছি। তারপর রাসূল আমাকে বললেন, যাও, এক্ষুণি আয়েশার নিকট গিয়ে তাকে বল, সে যেন তার নিকট রাখা যবগুলো তোমাকে দিয়ে দেয়। আর সে যবটুকু ছাড়া তো কোন খাবার এখন আমাদের নিকট নেই।

আমি যব আর দুম্বা নিয়ে শ্বশুরালয়ে এলাম। তারা সাদরে তা গ্রহণ করে বললো, যবগুলো দ্বারা আমরা রুটি তৈরীর ব্যবস্থা করছি আর আপনি দুম্বাটি দিয়ে আপনার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তরকারী পাকিয়ে

ফেলুন। তখন আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু তা যবাহ করে তরকারী পাকালাম। বৌভাতের রুটি ও গোশতের আয়োজন হলো। আমি রাসূলকে দাওয়াত দিলাম। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তা কবুল করলেন এবং যথাসময়ে উপস্থিত হলেন।

এরপর রাসূল আমাকে হযরত আবু বকর (রা)এর যমীনের পাশে এক চিলতে যমীন দিয়ে বললেন, এ যমীন তোমার। এখানে ঘর তুলে বসবাস কর। আমি সেখানে একটি কুঁড়েঘর তুলে আমার দাম্পত্য জীবনের শুভযাত্রা শুরু করলাম।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড ঃ রবীয়া ইবনে কা'ব (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* ছুয়ারুম মিন সিয়ারিস সাহাবা, ২১১ পৃষ্ঠা, দারু ইবনে হুজাইমা, রিয়াদ।

অপূর্ব আত্মদান

বদর যুদ্ধের চরম পরাজয়ের পর মক্কানগরীতে সেই যে শোকের ছায়া নেমেছে তা আজো মুছে যায় নি। মুশরিকরা আজও ভুলতে পারে নি তাদের সেই ব্যথা। মনে হয় এ পরাজয় তাদের জীবন থেকে সকল হাসি-আনন্দ কেড়ে নিয়ে গেছে। মক্কার আকাশে-বাতাসে এখন আর আগের সেই চঞ্চলতা নেই। মরুচারী যাযাবরদের সেই দুরন্তপনা নেই। সর্বত্র পরাজয়ের গ্লানি আর শোকের কালো হাতছানি।

কিন্তু হঠাৎ করেই আজ আবার মক্কার সর্বত্র নতুন চঞ্চলতা, অভিনব উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে দফ বাজিয়ে বাজিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফ্রী গোলাম সবাইকে তানঈমে সমবেত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে গেলো। বলে গেলো, মুহাম্মদের ঐ চরটিকে আজ শূলে বিদ্ধ করা হবে, যে বদর যুদ্ধে হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিল। ঘোষণার পর সবই ছুটলো তানঈম প্রান্তরে।

তানঈমের মুক্ত প্রান্তর। ভিড় করেছে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই। করতালি আর 'হোবল' 'হোবল' ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আজ এ চির শান্ত প্রান্তর অশান্ত হয়ে উঠেছে। কাফির মুশরিকদের চোখে-মুখে আজ প্রতিহিংসার পাশবিক উল্লাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জনতার প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে বন্দী সাহাবী খুবাইব ইবনে আদী (রা) কাফিরদের হৈ হুল্লোড় আর চিৎকার উপেক্ষা করে নির্বিকার নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন অন্য জগতের কোন চিন্তা ফিকিরে তিনি নিমগ্ন। অথচ তাঁর সামনেই স্থাপিত হয়েছে শূল-কাষ্ঠ। কিছুক্ষণ পর তাঁকে শূলে চড়তে হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও খুবাইব (রা)এর মাঝে কোন অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা নেই। হিম শীতল মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকার কোন আতঙ্ক নেই, কোন বিষন্নতা নেই।

এক মুশরিক পায়ে পায়ে সম্মুখে এগিয়ে এসে বললো, এই ধর্মত্যাগী! পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছিস? এবার তোর জীবনলীলা

এখানেই সাঙ্গ করবো। চিরতরে স্তব্ধ করে ফেলবো তোর হৃদস্পন্দন। বল্ এই অন্তিম মুহূর্তে তোর কি কোন কামনা-বাসনা আছে?

খুবাইব (রা) মুখ তুলে তাকালেন। চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে তাঁর দৃষ্টি প্রশ্নকারীর মুখের উপর এসে থামলো। বললেন, 'হাঁ, দু' রাকাত নামায পড়ার কামনা আছে।' নশ্বর এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চির বিদায়ের পূর্বে যেন তিনি তঁর প্রিয়তমের সাথে কয়েক মুহূর্ত কাটাতে।

চারদিকে কাফির মুশরিকদের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর মাঝে অন্তিম আকাঙ্খা পূরণের জন্য খুবাইব ইবনে আদী (রা) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহ-প্রীতির কী এক অনুপম দৃশ্য! নিজ সত্তা হারিয়ে তিনি যেন কোথায়, কোন্ সুদূরে চলে গেছেন। তিনি যেন গোপন অভিসারে প্রেমাস্পদের কানে কানে প্রেম কথা বলছেন। জীবনের সঞ্চিত সকল প্রেম-ভালবাসা আর ভক্তি-শ্রদ্ধা পরওয়াদিগারের পদতলে উজাড় করে দিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন।

নিরাকার রবের ইবাদতে যে এমনিভাবে আত্মহারা হওয়া যায়, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইবাদতকেও যে শেষ আকাঙ্ক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যায় হাতে গড়া মূর্তিপূজারী মুশরিকরা তা ভাবতেও পারে নি। তাই তাদের চোখ আজ বিস্ফারিত, পলকহীন। তাদের বিবেক আজ স্তব্ধ, শক্তিহীন। হাজারো প্রশ্নের বুদবুদ আজ তাদের মাথায়। আহ! আমরা কি এমন আত্মহারা হয়ে ইবাদত করতে পেরেছি? আমরা কী কখনো প্রতিমার সামনে এমন কায়মনোবাক্যে দাঁড়িয়েছি? অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ পেলে আমরা কী প্রতিমা পূজাকেই নির্বাচন করতাম? বিবেকের এই হাজারো প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাদের অনেকেই শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলো।

নামায শেষে তাঁকে শূলে চড়ানো হলো। সারিবদ্ধ তীরন্দাজ দলের একেকটি তীর গিয়ে বিদ্ধ হতে লাগলো তাঁর দেহে। কিন্তু আল্লাহ-প্রেমে নিবেদিতপ্রাণ খুবাইব (রা) তখন অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত। একটি বারের জন্যও তাঁর মুখে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বের হলো না। নশ্বর দেহের সাথে কি আচরণ চলছে সেদিকে নয় বরং আরো ঊর্ধ্বে কোন্ অদৃশ্যলোকে তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে। গভীর প্রশান্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল তখন দীপ্তিমান। হয়তো বেহেশতের হুর-গেলমান আর অপ্সরীরা তাঁকে হাতছানি দিয়ে

ডাকছে। হয়তো চির শ্যামলিমাময় জান্নাতের নয়নাভিরাম সবুজ বাগ–বাগিচায় তাঁর দৃষ্টি আটকে গেছে।

ইতিমধ্যে এক কাফিরের ডাকে খুবাইব (রা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরালেন। লোকটি বললো, 'খুবাইব। তুমি চাইলে এখনো পরিবার–পরিজনের কাছে ফিরে যেতে পারো। তবে তোমার স্থানে শূলে বিদ্ধ হবে তোমাদের নবী মুহাম্মদ।'

কথাটি শুনামাত্রই জ্বলে উঠলো মৃত্যুপথ যাত্রী খুবাইব (রাঃ)এর চোখের তারা। ঘৃণা আর ক্রোধের আগুন তাঁর চোখ থেকে ঠিকরে বেরুতে লাগলো। নেতিয়ে পড়া শিরটি আবার আঘাত খাওয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ফুঁসে উঠলো। অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন, রাসূলের পায়ে সামান্য কাঁটা ফোটার বিনিময়ে আমার মুক্তি হলেও আমি তাতে রাযী নই। রাসূলের সামান্য কষ্টের চেয়ে আমার মৃত্যু শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

সবাই স্তব্ধ। সবাই হতবাক। কারো মুখে কোন বাকস্ফুরণ নেই। বিস্ময়ে বিহবলের ন্যায় তারা ভাবে, সত্যই কি কঠিন মৃত্যু–যাতনা ভুলেও কেউ প্রেমাস্পদের বিপদাশঙ্কায় শিউরে উঠতে পারে? নিজের মৃত্যু যাতনাকে কি এত সহজে ভুলে যেতে পারে?

এবার কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ানের ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠলো। বিস্ময়ে বিমোহিত তার কণ্ঠ। বললো, আশ্চর্য! মুহাম্মদকে তাঁর সাথীরা যেমন ভালবাসে আর কেউ পারবে না এমন করে অন্যকে ভালবাসতে।

তীরন্দাজ দলের তীরে তীরে ক্ষতবিক্ষত হলো তাঁর গোটা দেহ। নেতিয়ে পড়লো তাঁর উন্নত শির। নশ্বর দেহ–পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেলো তাঁর অবিনশ্বর আত্মা। কিন্তু তাঁর প্রশান্ত মুখের সেই অনাবিল হাসি এখনো মিলিয়ে যায় নি। হয়তো এ হাসিমুখ কোন দিন মলিন হবে না।

সহায়তায় * রিজালুন হাওলার রাসূল, ৩৯২ পৃষ্ঠা। দারুল জীল, লেবানন।
* হায়াতুস সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব আল আরাবী, লেবানন।

আলোর পরশে

মরুর রাগী সূর্যটি আজ অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আদিগন্ত বিস্তৃত বালু সাগরে মুঠি মুঠি আগুন ছড়াচ্ছে। চারদিকে গনগনে উত্তাপ। এরই মাঝে স্বর্গীয় স্নিগ্ধ শীতল পরশে বায়তুল্লাহর এক চিলতে ছায়ায় বসে বদরের নির্মম পরাজয়ের স্মৃতিচারণ করছিলো সুফিয়ান ইবনে উমাইর আর উমাইর ইবনে ওহাব।

সুফিয়ান ঃ ভাই উমাইর! আবুল হাকাম, উৎবা আর শায়বার পর জীবন স্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারদিক অশান্তি আর বিষাদের জ্বালা জীবনকে অস্থির করে তুলছে।

উমাইর ঃ সত্যিই বলেছো বন্ধু। বদরের বিপর্যয় যেন দুমড়ে মুচড়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। বুকভরা বেদনা নিয়ে যেন বায়ুর দল মাতম তুলে তুলে মক্কার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। বেদুঈন বালাদের নিটোল হাসি আর রাখাল বালকদের বিচিত্র বাঁশি এখন আর মরুর বুকে স্বর্গীয় সুরের মূর্ছনা তুলে না।

সুফিয়ান ঃ প্রতিশোধ এর নিতেই হবে। এ বিপর্যয় কিছুতেই সহ্য করা যায় না। আবুল হাকামের খুনের বদলা খুন দিয়েই নিবো হে উমাইর! কথার সাথে সাথে জিঘাংসার একরাশ লকলকে অগ্নিশিখা উথলে উঠলো তার কোটর থেকে।

উমাইর ঃ যদি ঋণের অসহনীয় বোঝা আমাকে নেতিয়ে না ফেলতো, যদি নিষ্পাপ কচি সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে ব্যাকুল না করতো, তবে শপথ করে বলছি, আমি একাই আবূ তালিবের ভাতিজার যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিতাম।

সুফিয়ান ঃ তাই নাকি? সত্য বলছিস?

উমাইর ঃ লাতের কসম, মানাতের কসম, খুনের বদলায় খুন নিয়ে তবে মক্কায় ফিরতাম। জানিস আমার নাম উমাইর। তার কণ্ঠ চিরে

একরাশ উত্তেজনা আর আক্রোশ ঝরে পড়লো।

সুফিয়ান ঃ বেশ, তা হলে আমি তুলে নিলাম তোর সকল ঋণের বোঝা। আমিই তা পরিশোধ করবো। আর তোর সন্তানদের আমিই মানুষ করবো। এই বায়তুল্লাহকে সামনে রেখে, এই হোবলকে সামনে রেখে বলছি, প্রতিশ্রুতি পূরণে আমি একটুও নড়চড় করবো না।

এক অসম্ভব হিংস্রতা আর বর্বরতা সারা দেহের রক্ত থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো উমাইরের গলায়। বললো, অবশ্যই রাজী, অবশ্যই রাজী, তবে আমার এই প্রতিজ্ঞার কথা অবশ্যই গোপন রাখবে। কাউকে বলবে না। আমি আজই তলোয়ার শান দিয়ে বিষ মেখে নিবো।

রাসূলের গৃহ। দরজায় রীতিমতো জটলা। উত্তেজনা আর উতরোল ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুরাচার ইবনে ওহাব এসেছে। খাপে তার শাণিত তরবারী। মতিগতি সন্দেহজনক। কথাবার্তায় যথেষ্ট অসঙ্গতি।

ভোরের হাস্নাহেনার মতো মিষ্টি নির্মল এক হাসির রেখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, ওকে আসতে দাও। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) চলে গেলেন। উমাইরের তলোয়ারের বাট শক্ত করে ধরে উমর (রা) বললেন, এসো, রাসূল তোমায় ডাকছেন। আশেপাশে উপস্থিত সাহাবীদের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেললেন। যেনো বললেন, একি! দাঁড়িয়ে কেন? সাথে সাথে এসো। লোকটা বড়ই দুর্বৃত্ত। অত্যন্ত দুরাচার। কখন কি করে বসে বলা মুশকিল। সতর্ক থেকো।

একটু অগ্রসর হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে পেলেন। স্নিগ্ধ আর মমতাভরা স্থির দৃষ্টি তাঁর চোখের তারায়। বললেন, উমর! সে তো আমাদের মেহমান। মেহমানের সাথে একী আচরণ! তাকে নির্বিঘ্নে আসতে দাও। রাসূলের এক আকাশ মমতা আর ভালবাসা, এক সমুদ্র কোমলতা আর হৃদ্যতা অকস্মাৎ উমাইর ইবনে ওহাবের উত্তপ্ত দেহটিকে খরার দাবদাহ থেকে যেন হিম শীতল ছায়ায় নিয়ে এলো। তার মন-মস্তিষ্ক আর চিন্তা-চেতনায় ভীষণ ভাঙ্গন

শুরু হলো।

রাসূল এবার বললেন, উমাইর! কেন এসেছো? অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার পর বীণায় ছড়িয়ে থাকা গুঞ্জনের মতো উমাইরের কানে রাসূলের গভীর মমতা ও মায়াময় কথাগুলো গুঞ্জরিত হতে লাগলো। কতো মিষ্টি মধুর আর মায়াময় তাঁর কথাগুলো।

অধোমুখে বিনীত কণ্ঠে উমাইর বললো, যুদ্ধে বন্দী ছেলেটিকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। তারপর চোখ তুলে তাকালো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে। ভোরের ফোটা শিউলির মতো একটা নীরব হাসি ছড়িয়ে আছে তাঁর সারা মুখ জুড়ে। মিটি মিটি হাসছেন রাসূল।

ঃ তবে তরবারী এনেছো কেন?

ঃ একাকী মরুভ্রমণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

ঃ সত্যি বলো। কেন এসেছো?

এবার উমাইরের হৃদয়ে অস্থির ভাবনার ডানা ঝাপটানো শুরু হলো। কপালের কুঞ্চনে তাদের শোরগোল দেখা গেলো। ভেড়ার জিভের ন্যায় কয়েকবার শুকনো জিভটা নড়ে উঠলো। কিন্তু একটি কথাও ফুটলো না তার মুখ দিয়ে। দূরপাল্লার চাহনি মেলে তাকালেন আল্লাহর রাসূল। দূরে, বহু দূরে, দিগন্তের নীলিমায়, যেখানে প্রকৃতি একে অপরকে আলিঙ্গন করে আছে। তারপর বলতে লাগলেন—যেন সব কিছু দেখে দেখে বলছেন। মিথ্যে বলো না উমাইর! বরং তুমি কাবাগৃহের চত্বরে বসে সুফিয়ানের সাথে প্রতিজ্ঞা করলে, যে করেই হোক বদরের নির্মম পরাজয়ের প্রতিশোধ তুমি নিবে। তাই বিষমাখা তলোয়ার নিয়ে কুমতলবে এসেছো।

হতবুদ্ধিতার পাতায় তির তির করে উমাইর কাঁপতে লাগলো। বিস্ময়ে চোখটা বড় হতে হতে এক আকাশ শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠলো। কই! কেউ তো ছিলো না আমাদের সাথে। কোন কান তো শোনে নি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞার কথা। তবে কী তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল! চিন্তার ভাঁজে ভাঁজে হিংস্রতা আর শত্রুতার বাঁধনগুলো

কেটে কেটে তার সারা শরীর শিথিল হয়ে গেলো। অন্তরের সব গলি পথগুলো স্বর্গীয় আলোর বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বসন্তের শান্ত স্নিগ্ধ হাওয়ায় কুসুমকলির ন্যায় কেঁপে উঠলো তার আপাদমস্তক। নিজেকে সঁপে দিলেন রাসূলের পদপ্রান্তে। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সত্যের দিশা দিন। আমি আলোর পিয়াসী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।'

রঙিন ডানায় ঝিলমিলিয়ে উমাইর উড়ে গেলো হেরার প্রদীপ্ত আলোর দিকে। এক আকাশ জ্যোতির দিকে। পিছনে পড়ে রইলো নিকষ কালো অন্ধকার আর সীমাহীন গুমরাহীর বিস্তৃত প্রান্তর।

সহায়তায় * রিজালুন হাওলার রাসূল, ৩৪২ পৃষ্ঠা। দারুল জীল, লেবানন।
* ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, প্রথম খণ্ড, উমাইর ইবনে ওহাব (রা)–এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।

একটি চড়াই

মদীনা নগরী। সুদূর বিস্তৃত মরু সাগরের মাঝে সবুজের টিপ পরা ছো একটি মরুদ্যান। নির্দয় মরুর রুক্ষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারই বুকে শির উঁচু করে এই সবুজ শ্যামল মরুদ্যানটি দাঁড়িয়ে আছে। যেন শান্তির চির সমাবেশের আয়োজন করছে। সারাদিন লু হাওয়ার আগুনে–ঝাপটায় কিছুটা নেতিয়ে পড়লেও রাতের কোমলতা ও শীতলতায় আবার তা সতেজ, সবল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

এই সবুজ শ্যামলিমায় ভরা মদীনায় বহু সুস্বাদু খেজুর বাগান থাকলেও আবূ তালহা (রা)–এর বাগানটির সাথে কোন তুলনা হয় না। বাগানটি যেমন সুদূর বিস্তৃত তেমন তার প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য। প্রচণ্ড খরতাপেও সেখানে ফুরফুরে শীতল স্নিগ্ধ বায়ু আনন্দের শিহরণ তুলে উড়ে উড়ে যায়।

আর ভরা মৌসুমে যখন ঠাসা ঠাসা পাকা খেজুরের সারি সারি স্তবক ঝুলে থাকে, যখন অপূর্ব সৌরভে চারদিক মৌ মৌ করতে থাকে আর মধু মক্ষিকারা মনের আনন্দে ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জন তুলে উড়তে থাকে তখন দর্শক মাত্রই বিমোহিত হয়। বিস্মিত হয়। লোভাতুর এক পলক চাউনি চোখে ফুড়ে ঠিকরে পড়ে ডাসা ডাসা পাকা স্তবকের উপর। তাই সে পথ দিয়ে কেউ গেলে একবার হলেও আবূ তালহা (রা)–এর বাগানে ঢু মেরে যায়। বাগানের মোহনীয় দৃশ্য না দেখে গেলে গমনকারীর চোখ–মন যেনো শান্তি পায় না।

একদিনের ঘটনা। আবূ তালহা (রা) তার বাগানের একটি গাছের ছায়ায় নিবিষ্ট মনে নামায পড়ছেন। চার পাশের কোন খেয়াল নেই। একেবারে তন্ময়। একেবারে আত্মহারা। রবের সামনে বিনয় বিনম্রভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। ইহলোকের সকল অস্তিত্ব হারিয়ে তিনি তখন নামাযে মগ্ন।

হঠাৎ বাগানে একটি চড়াই পাখি ঢুকে পড়লো। পাখিটি দারুন চমৎকার। ভারী চঞ্চল। চিক্ চিক্ কিচির মিচির করছে। শব্দের তালে তালে উড়ছে। লেজ দুলিয়ে নাচছে আর মনের অফুরন্ত আনন্দে এ কাঁদি থেকে ঐ কাঁদিতে, এ স্তবক থেকে ঐ স্তবকে উড়ে উড়ে গান গাচ্ছে। মনোমুগ্ধকর পাখির এই দৃশ্য আবূ তালহা (রা)এর দৃষ্টিতে পড়লো। অজান্তে তার মন সেদিকেই ছুটলো। ভারি চমৎকার তো পাখিটি! মোহনীয় গান আর নৃত্যে যেন গোটা বাগানটি মাতিয়ে তুলছে। আল্লাহর কী মহিমা! কী সুন্দর তাঁর সৃষ্টি! কী অপূর্ব তাঁর মাখলুক! চিন্তার দোলায় দোল খেতে খেতে তিনি নামাযের কথা ভুলে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠলো। আরে! নামাযের মাঝে এসব কী বাজে চিন্তা? হায়! হায়! কতো রাকাত পড়েছি? ছি— ছি, তাও ভুলে গেলাম। দু' রাকাত পড়লাম, না তিন রাকাত? অস্থির হয়ে উঠলো তার মন। ব্যাকুল বেচাইন হয়ে উঠলো তাঁর হৃদয়। আর স্থির থাকতে পারলেন না। শান্ত থাকতে পারলেন না। ভাবলেন, যত্তসব নষ্টের গোড়া এই বাগানটি। সুতরাং এরই একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। একটা চূড়ান্ত ফায়সালা করতে হবে।

দারুন আক্ষেপ আর মর্মজ্বালা নিয়ে ছুটে এলেন রাসূলের দরবারে। দারুন অস্থির। অত্যন্ত বেচাইন। অন্তরে তাঁর অস্বাভাবিক তোলপাড়। রাসূলকে ঘটনাটি আগাগোড়া শুনালেন। অত্যন্ত মর্মাহত হৃদয়ে তা ব্যক্ত করলেন। ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠ তখন ভারী হয়ে এলো। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী, আমি আমার এই বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। আপনি আজ থেকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে তা ব্যয় করুন। আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড ঃ আবূ তালহা আনসারী (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* হায়াতুস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব আল আরাবী, লেবানন।

রাসূলের আতিথেয়তা

মসজিদে নববী। মদীনার মসজিদ। খেজুর পাতার ছাউনী দেয়া এক অনাড়ম্বর ছোট্ট মসজিদ। একেবারে সাদাসিধে। কোন গম্বুজ নেই। কোন মিনারা নেই। আলোর কোন ঝলকানি নেই। একেবারে ছিমছাম। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নূরের মসজিদ।

সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নামায পড়তে এলেন। অদূরে পৌছতেই সহসা তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মসজিদের খামের সাথে বাধা এক বন্দীর উপর। পোষাক–পরিচ্ছদ, আর বেশভূষায় একটা কৌলীন্য কৌলীন্য ভাব পরিস্ফুট। সর্দার সর্দার মনে হয়। ফলে রাসূলের দৃষ্টি আরো প্রখর হলো। আরো তীক্ষ্ণ হলো। যেন টর্চের প্রখর আলো এসে খামের উপর পড়লো। হাঁ তাই তো! সে তো ইয়ামামার বনু হানীফা গোত্রের সর্দার সুমাম ইবনে উসাল। হৃদয়ের গভীরে যেন খচ খচ করে উঠলো। আহা, আহা, একজন সম্মানী মানুষের এতো অপমান। হোক না সে অমুসলিম! হোক না সে কাফির! রাসূলের হৃদয় তন্ত্রীতে একটি বেদনার সুর মূর্ছনা তুলে তরঙ্গায়িত হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেলো। ভোরের মৃদু বাতাসের দোলায় বৃক্ষপল্লব যেমন তির তির করে কেঁপে উঠে তেমনি কেঁপে উঠলো রাসূলের হাত। ইশারায় উপস্থিত সাহাবীদের ডাকলেন। অত্যন্ত গম্ভীর তাঁর মুখমণ্ডল। কোমলে কঠোরে মেশানো তাঁর কণ্ঠস্বর। বললেন, জানো ইনি কে? কাকে তোমরা এভাবে বেঁধে রেখেছো?

রাসূলের কণ্ঠস্বরে সাহাবীদের অন্তরে একটা অন্যায় অন্যায় ভাব ছড়িয়ে পড়লো। আমতা আমতা করে ভয় বিজড়িত কণ্ঠে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভুল হয়ে গেছে। মদীনার উপকণ্ঠে সন্দেহমূলক চলাফেরা করছিলো। তাই বন্দী করা হয়েছে। রাসূলের কণ্ঠে শান্ত শান্ত ভাব ফিরে এলো। বললেন, ইনি ইয়ামামার দুর্ধর্ষ বনু হানীফার সর্দার* সুমামা ইবনে উসাল। যাও, বন্দীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ কর। তার সেবা কর।

রাসূলের আর মসজিদে যাওয়া হলো না। ঘরে ফিরে এলেন। বললেন, ঘরে যে খাবার আছে মসজিদে পাঠিয়ে দাও। আর উটনীর দুধও যেন পৌঁছে। রাসূলের মাত্র একটি নির্দেশে, মাত্র একটি হুকুমে সব পাল্টে গেলো। বন্দী হলো মেহমান। রাসূলের মেহমান। সম্মানিত অতিথি। হেরেম থেকে খাবার গেলো। এখন সবার আচার–আচরণে একটা অন্যরকম ভাব। সবাই যেন বন্দীর একটু খিদমত করতে চায়। একটু খাতির করতে চায়।

রাক্ষুসে ক্ষুধায় কাতর তখন সুমামা। এতো কিছু ভাববার বা চিন্তা করার ফুরসত কোথায়? আগে খাবার খেলো। তারপর অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে দুধটুকু পান করলো। সে জানে, যতো আপ্যায়ন আর সমাদর তাকে করা হোক তবুও সে বন্দী। কোথাও সে যেতে পারবে না। পালাতে পারবে না। প্রহরীর সজাগ দৃষ্টি তাকে সর্বদা তক্কে তক্কে রাখছে। কারণ, এই তো কিছুদিন আগে সে রাসূলের কয়েকজন সাহাবীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিচার শুরু হলেই পালাবদল হবে। সব উল্টে যাবে। এসব আপ্যায়ন আর আতিথেয়তা তখন কোথায় উবে যাবে। তাই তার হৃদয় গভীরে একটি ভয়ের, একটি আতঙ্কের তীক্ষ্ণ সূঁচালো কাঁটা বারবার ফুটছিলো। একটি অস্থিরতা, একটি দুশ্চিন্তা তাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরছিলো।

তবুও খাবারের পর সুমামা এখন কিছুটা পরিতৃপ্ত। কিছুটা শান্ত। শরীর আর মন এখন বেশ চাঙ্গা। বেশ ঝরঝরে। ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট এলেন। মুখজুড়ে তাঁর মিষ্টি মধুর হাসি। হৃদয় জুড়ে মেঘমুক্ত আকাশের উদারতা আর বিশালতা। কন্ঠে তাঁর গভীর ভ্রাতৃত্ব আর সম্প্রীতির আহবান। বললেন, সুমামা! কী ভাবছো? আশা–নিরাশা আর আলো–আঁধারে দোলায়মান সুমামার কণ্ঠ। তবে তা স্পষ্ট। বাস্তবতার কোলে লালিত। বললো, হত্যার বিনিময়ে আমাকে হত্যা করতে চাইলে তা পারবে আর ক্ষমা করে দিলে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলে। আর যদি সম্পদ চাও তবে তাই দেবো।

সুমামার উত্তর শুনে রাসূল একেবারে শান্ত। একেবারে নির্বিকার। কিছুই বললেন না। আবার সেই নির্মল মিষ্টি মধুর হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ওষ্ঠাধরে। তারপর ধীর পদক্ষেপে পায়ে পায়ে চলে গেলেন। রাসূলের

প্রস্থানের পর সুমামার অন্তরে হাজারো চিন্তার ডানা ঝাপটানি শুরু হলো। চিন্তার ভেলায় চড়ে তিনি যেন অজানা উদ্দেশ্যে ভেসে চললেন। হায়! এরা আমার সাথে কত সুন্দর ব্যবহার করছে। কত মধুর আচরণ করছে। অথচ আমি এই তো কিছুদিন পূর্বে এদের কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছি। এই অমার্জনীয় অপরাধ সত্ত্বেও এরা আমাকে এখনো কিছুই বলছে না। কোন শাস্তি দিচ্ছে না। গোটা আরবে কেউ কি এমন করবে? নিশ্চয় না। বরং শত্রুকে দেখামাত্র তারা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। আর বাগে পেলে তো কোন কথাই নেই। নির্মমভাবে হত্যা করে মাথার খুলিতে সুরা পান করে জিঘাংসার জ্বালা জুড়াবে।

কিন্তু মুহাম্মদ ও তাঁর অনুচররা যেন একেবারে ভিন্ন। যেন অন্য জগতের মানুষ। যেন আকাশের নিষ্পাপ ফেরেশতা। কতো শান্ত! কতো সুন্দর! পরস্পরের মাঝে কী গভীর ভালবাসা ও সম্প্রীতি! এরা কতো নিবিড় আত্মহারা হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। নামায পড়ে। আরবের বুকে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। বহু অভিজ্ঞতার আধার আমি। কাউকে তো কখনো এমন দেখি নি। চিন্তার গলি পথে চলতে চলতে সুমামা বহু দূর চলে গেলো। চড়াই–উৎরাই পেরিয়ে যেন গোটা আরব ঘুরে এলো। ভাবতে ভাবতে সুমামা দারুন আনমনা হয়ে গেলো। সত্যে–মিথ্যার আলো–আঁধারে দুলতে লাগলো।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক আগে। এখন পড়ন্ত বিকেল। রৌদ্র দগ্ধ মরুর বুকে এখন শীতল বায়ুর প্রচুর আনাগোনা। দূর পাহাড়ের কোলে হালকা হালকা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এলেন। সেই আগের মতই। গোটা চেহারায় সেই দীপ্যমান নির্মল হাসি। চোখের তারায় গভীর ভ্রাতৃত্ব আর সম্প্রীতির আহবান। সহানুভূতি আর সহমর্মিতায় ভরা তাঁর কণ্ঠ। বললেন, সুমামা! কী ভাবছো?

রাসূলের সেই একই প্রশ্নে সুমামা একেবারে স্থির হয়ে গেলো। চিন্তাশক্তি তার থমকে দাঁড়ালো। কিছু বুঝার বা চিন্তা করার আগেই তার ওষ্ঠাধর তির তির করে কেঁপে উঠলো। বললো, আমার ঐ একই কথা। ক্ষমা করে দিলে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলে আর রক্তের বিনিময়ে হত্যা করলে তাও পারবে। আর যদি সম্পদ চাও তবে তাই দেবো।

এবারও রাসূল আগের মতো শান্ত, নিরব। কোন কথা বললেন না। কোন উত্তর দিলেন না। সেই দীপ্যমান নির্মল হাসির রেখা তাঁর চেহারায় আবার ফুটে উঠলো। চোখের তারায় গভীর ভ্রাতৃত্ব বোধের আহবানের তীব্রতা যেন আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। তিনি পায়ে পায়ে চলে গেলেন। ঠিক যেমনি এসেছিলেন তেমনিভাবে। ধীর-গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গভীর রাত। গোটা মদীনা ঘুমে অচেতন। চারদিক নিরব নিস্তব্ধ। কোন সাড়া শব্দ নেই। কোন ডাক-চিৎকার নেই। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানি আর লা-ওয়ারিশ কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার এ গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে শত ভাঙ্গন সৃষ্টি করে আবার অনন্তে হারিয়ে যাচ্ছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে গোটা মদীনা। কিন্তু সুমামার চোখে ঘুম নেই। আকাশের তারার মতো তার চোখ দুটি পিটপিট করছে। আর তার অশান্ত হৃদয় অনন্ত আকাশের নীলিমায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। চিন্তার ডানায় ভর করে তিনি কোথায় কোন্ অজানা লোকে উড়ে যাচ্ছে আর হিদায়াতের আলোর পরশে তার হৃদয় আলোকময় হয়ে উঠছে। এক সময় একদল তন্দ্রা এসে তার চোখের পাতা মুদে দিলো। ঘুমের অসীম রাজ্যে সে হারিয়ে গেলো।

পরদিন সকালে ঝলমলে সূর্যের আলোয় দীপ্ত উজ্জ্বল গোটা মদীনা। বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে রাসূল এলেন। একেবারে সুমামার নিকটে এসে দাঁড়ালেন। বেলফুলের শুভ্রতা আর সৌরভে যেন মোহিত তাঁর মুখমণ্ডল। তাঁর ওষ্ঠাধর। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর অলৌকিক শক্তিতে ভরা তাঁর কণ্ঠ। তিনি বললেন, সুমামা! এখনো তুমি কী ভাবছো?

সুমামার চিন্তা তখন ঊর্ধ্বমূখী। দেখি কী হয়। কতটুকু যায়। তাই বিনীত কণ্ঠে আগের মতই বললো, নতুন কিছু ভাবি নি। তাই ক্ষমা করলে একজন কৃতজ্ঞকে ক্ষমা করলে আর হত্যা করলে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করলে। আর যদি ধন সম্পদ চাও তবে তাই দেবো।

সুমামার উত্তর শুনে রাসূল নিরব হয়ে গেলেন। যেন নিরবতার মহাসাগরে হারিয়ে গেলেন। চোখে তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফুটে উঠলো। সে দৃষ্টির বোরাকে চড়ে তিনি যেন অজানা লোকের রহস্য সন্ধানে

হারিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ এমনি কেটে গেলো। কোন কথা নেই। কোন বার্তা নেই। তারপর তাঁর মাথা দুলে উঠলো। যেন তিনি তার কাঙ্খিত বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। যেন তিনি অজানা রহস্য আবিস্কার করে ফিরে এসেছেন। উপস্থিত সাহাবীদের হুকুম দিলেন। এখনি সুমামার বন্ধন খুলে দাও। সে এখন থেকে মুক্ত। একেবারে স্বাধীন।

সুমামা এখন মুক্ত। তার সকল বাঁধন অবারিত। সকল পথ তার উন্মুক্ত। কোন বাধা নেই। কোন প্রতিরোধ নেই। তাই দু' কূল ছেপে তার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। মসজিদে নববীকে পিছনে ফেলে সে আপন মনে চলতে লাগলো। মদীনার অদূরে বাকী নামক এক প্রান্তর। তার অদূরে এক চমৎকার খেজুর বাগান। স্বচ্ছ ফোয়ারায় নির্মল পানির সেখানে কোন অভাব নেই। সুমামার উটনী চলতে চলতে ফোয়ারার পাশে এসে থামলো। ফোয়ারার স্বচ্ছ পানিতে সুমামা গোছল করলো। মনটা এখন তার দারুন ঝরঝরে। জীবনের সকল ক্লেদ, সকল ময়লা, সকল অন্ধকার ধুয়ে মুছে সে যেন এখন স্বচ্ছ, সুন্দর, পূতপবিত্র। গোছলের পর আবার মসজিদে নববীতে ফিরে এলো। তার মনের আকাশে এখন আনন্দ আর স্ফূর্তির শুভ্র পায়রাগুলো শুধুই ডিগবাজি খাচ্ছে।

মসজিদে নববীতে তখন সাহাবীদের একটি ছোট্ট জটলা বসেছিলো। সুমামা এসে উচ্চ কণ্ঠে কালিমা পাঠ করলেন। "আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু।" 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।'

সাহাবীরা সুমামার ইসলাম গ্রহণে অবাক হয়ে গেলো। হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। পরক্ষণেই এক অভাবনীয় আনন্দের মিছিল তাদের অন্তরে উতলা হয়ে উঠলো। আনন্দের আতিশয্যে তাঁরা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

সুমামা ইবনে উসাল এখন রাসূলের সাহাবী। সত্যের নির্ভীক সৈনিক। দুর্দম কাফেলার সহযাত্রী। হৃদয়ে তাঁর কোন ভয় নেই। কোন শঙ্কা নেই। সত্যের রাহে জীবন দিতে তিনি এখন সদা প্রস্তুত। এক ঝাক আলোর আবাবিলের সাথে তিনি উড়ে চললেন আলোর দেশে। পিছনে পড়ে রইলো চাপ চাপ অন্ধকার আর পূতিগন্ধময় পাপের রাশি।

আকাশের কোলে

গভীর রাত। মদীনার আকাশে তারার মেলা। তারকারাজীরা যেন ডাগর ডাগর চোখ মেলে ঘুমন্ত মদীনার দিকে চেয়ে আছে। সে চোখে কোন ক্লান্তি নেই। কোন বিরাম নেই। পিট্ পিট্ করে নির্নিমেষ নয়নে শুধু চেয়েই আছে। বড় মায়া, বড় ভালবাসা, অসীম তৃপ্তি সে চোখে। শান্ত সমাহিত চারদিক। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। ফুরফুরে প্রাণ জুড়ানো বাতাসের আনাগোনাও প্রচুর। তাই মদীনা আজ ঘুমন্ত নগরী। অচেতন নগরী। স্বপ্নের নগরী।

কিন্তু সাহাবী উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা)এর চোখে কোন তন্দ্রা নেই। কোন ঘুম নেই। বাড়ির আঙ্গিনায় বসে বসে স্মৃতিচারণ করছেন। অতীতের গর্ভে গচ্ছিত জীবন পাতার সোনালী পৃষ্ঠাগুলো উল্টে পাল্টে দেখছেন। পাশেই ছেলে ইয়াহ্ইয়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে ঘুমের গভীরতারও যেন শেষ নেই। অন্ত নেই। অদূরে বহু আদরের লালিত ঘোড়াটি মাঝে মাঝে নড়েচড়ে শব্দ করছে। আবার নিরব হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক তখন উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা)এর অন্তরে আল্লাহর মহিমা, নেয়ামতরাজি ও পরকালের চিন্তার এক চিলতে শুভ্র মেঘ উড়ে গেলো। মুহূর্তে তাঁর হৃদয় কেমন জানি চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই নিবিড়ঘন শান্ত পরিবেশে আল্লাহর পদপ্রান্তে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে মনটা তাঁর ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠলো। সাথে সাথে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ নামায যেন স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন–সেতু। প্রেমিক–প্রেমাস্পদের গোপন অভিসার। ভাবাবেগে তন্ময় তখন উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা)এর অন্তর। সূরা ফাতেহার পর তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু করলেন।

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"আলিফ–লাম–মীম, সে কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য তা হিদায়াত। যারা পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে আর আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক থেকে দান করে। আর যারা আপনার নিকট অবতীর্ণ ও আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব বিশ্বাস করে আর পরকালের ব্যাপারে তারা স্থির বিশ্বাসী।"

আর তিলাওয়াত করতে পারলেন না। আর অগ্রসর হতে পারলেন না। বাধা ঘোড়াটি প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটাছুটি শুরু করলো। উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা)এর তিলাওয়াত থেমে গেলো। সাথে সাথে ঘোড়াটিও শান্ত নিরব হয়ে গেলো। চারদিক আবার গভীর নিরবতায় ডুবে গেলো। তিনি আবার তিলাওয়াত শুরু করলেন।

اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"তারাই তাদের রবের প্রদর্শিত হিদায়াতে রয়েছে। আর তারাই সফলকাম।"

এতটুকু তিলাওয়াত করতে না করতেই ঘোড়াটি আবার প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু করলো। ফলে উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা)এর তিলাওয়াত আবার থেমে গেলো। সাথে সাথে ঘোড়াটিও নিরব শান্ত হয়ে গেলো।

ঠিক এমনিভাবে ঘটনাটি কয়েকবার ঘটলো। যেই তিনি তিলাওয়াত শুরু করেন অমনি ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করে। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেই আবার ঘোড়াটি শান্ত নিরব হয়ে যায়। হঠাৎ তার অন্তরে একটি ভয়ের, একটি আশঙ্কার উন্মেষ ঘটলো। আরে! ঘোড়াটি যদি লাফিয়ে ছেলের উপর পড়ে। তাহলে তো মহাবিপদ। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ছেলেকে ডাকতে অগ্রসর হলেন।

সহসা তাঁর দৃষ্টি মুক্ত আকাশের মহাশূন্যতায় পড়ে একেবারে আটকে গেলো। দেখলেন, মুক্ত আকাশের কোলে এক বিরাট আলোকমালা। হাজার হাজার ঝাড়ের আলোও তাতে লীন হয়ে যাবে। ঐ আলোকমালার জ্যোতিতে চারদিক উজ্জ্বল আলোয় ফক্ ফক্ করছে। এক মোহময় রোশনীতে চারদিক উজ্জ্বল, আলোকিত। ধীরে ধীরে আলোকমালাটি দূর

আকাশে দূরীভূত হতে হতে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেলো।

বিস্ময়কর এই ঘটনাটি তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করলো। তিনি এর রহস্য কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেন না। বরং নানা চিন্তা আর বিচিত্র ভাবনার মেলা বসলো তাঁর অন্তরে।

পরদিন প্রভাতের বিমল আলো ছড়িয়ে পড়তেই তিনি রাসূলের কাছে ছুটে এলেন। আগাগোড়া, আদ্যপান্ত সব কিছু খুলে খুলে রাসূলকে শুনালেন। রাসূল অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ঘটনাটি শুনলেন। তারপর তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। তাঁর চিন্তার ডানা আলোর গতিতে উড়তে উড়তে দূরে বহুদূরে আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে অনন্তলোকে গিয়ে হাজির হলো। তারপর আবার একই গতিতে ধরার বুকে ফিরে এলো। এবার মৃদু বাতাসের দোলায় দোলায়িত কুসুমকলির ন্যায় রাসূলের মাথা নড়ে উঠলো। চির সুন্দর ওষ্ঠাধর তাঁর কেঁপে উঠলো। বললেন, শোন উসাইদ! সেটা ছিলো অযুত ফেরেশতার একটি দল। তোমার কুরআন তিলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা তা শুনতে এসেছিলো। তুমি যদি তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে, তাহলে মদীনার সবাই দিবসের আলোতে মুক্ত আকাশের কোলে ফেরেশতাদের সেই দলটিকে দেখতে পেতো।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন.হায়াতিস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ড ঃ উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা)এর জীবনী, দারুল নাফায়েস, লেবানন।

সেই মালাটি

কুরাইশের আর সেই ধরি-মারি-খাই অবস্থা এখন আর নেই। বদর যুদ্ধের পর তাদের দু' চোখের তারায় শুধু মাত্র শর্ষে ফুল। কি হতে কি হয়ে গেলো কিছুই তারা বুঝলো না। শুধু কি তাদেরই এই প্রশ্ন? না, গোটা আরবের মানুষদের এই একই প্রশ্ন। এ আবার কেমন কথা? অস্ত্রশস্ত্রহীন মাত্র তিন শ' তের জনের সাথে এক হাজার সশস্ত্র নামকরা কুরাইশ যোদ্ধার নির্মম পরাজয়!! ভাবতেই শরীর শিউরে উঠে। মন কেঁপে উঠে।

যুদ্ধে সত্তরজন বীরযোদ্ধা নিহত হওয়াই কুরাইশের লাঞ্ছনা আর অবমাননার শেষ নয়। বরং আরো সত্তরজন বীরযোদ্ধাকে বন্দী করে মুসলমানরা অসহায় অবস্থায় মদীনায় নিয়ে গেছে। তাই লাঞ্ছনা আর অবমাননার কালো ছায়ায় তাদের চেহারা দারুন ফ্যাকাশে। অত্যন্ত মলিন। মক্কা এখন শুধুই খাঁ খাঁ করে। কোথায় সেই আবু জাহেল, উৎবা আর শায়বা? কোথায় সেই অলীদ, হানজালা আর উমাইয়া? এদের ছাড়া মক্কার কথা চিন্তা করতেই মনটা চনমনিয়ে উঠে। নিশ্চল স্তম্ভের মত চিন্তাশক্তি স্থির হয়ে যায়। কিছুই ভাবতে পারে না। কিছুই চিন্তা করতে পারে না। তাই পরাজয়ের এই ধকল সামলে নিতে তাদের বেশ কিছুদিন কেটে গেলো।

তারপর যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনার চিন্তা-ফিকির শুরু হলো। মদীনার পথে যাতায়াত শুরু হলো। মক্কার লোকেরা একের পর এক মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে আনতে লাগলো। বন্দীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে পণের পরিমাণ এক হাজার দিরহাম থেকে চার হাজার দিরহামে উঠানামা করতে লাগলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় কন্যা যয়নব (রা)এর স্বামী আবুল আসও মক্কার যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হয়েছে। সে এখন মদীনায় বন্দী। স্বামীর এ দুঃসংবাদ শুনে

হযরত যয়নব (রা) দারুন অধীর হয়ে পড়লেন। কিভাবে স্বামীকে মুক্ত করে আনবেন? কিভাবে স্বামীকে স্বাধীন করে আনবেন? এই চিন্তা, এই ভাবনা তাকে অস্থির করে তুললো। ব্যাকুল করে ফেললো। অবশেষে যয়নব (রা) স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে একটি মূল্যবান মালা দিয়ে মক্কার এক লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দারুন ব্যস্ত। ছোট্ট এই মদীনা নগরীর কতো শত্রু! কতো দুশমন! কতো তার সমস্যা! এসব কিছুই রাসূল দেখেন, বুঝেন ও সমাধান করেন। তাই তাঁর ব্যস্ততার যেন কোন অন্ত নেই। এরই মাঝে সেই লোকটি রাসূলের কাছে উপস্থিত হলো। মালাটি রাসূলের সামনে রেখে বিনীত কণ্ঠে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কন্যা যয়নব তাঁর স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে এই মালাটি পাঠিয়েছেন।

লোকটির সবগুলো কথা রাসূলের কানে পৌঁছলো কিনা তা বুঝা গেলো না। তবে মালাটির প্রতি রাসূলের দৃষ্টি পড়তেই তিনি কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। বিদ্যুতের মত তাঁর অন্তরটা হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠলো। চোখে তাঁর ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। সে দৃষ্টির আবছা আলো ক্রমেই অতীতের দিকে ছুটতে ছুটতে মক্কার সেই ক্ষণস্থায়ী সোনালী দিনগুলোতে গিয়ে পৌঁছলো। দু'চোখের সামনে হাসি হাসি নির্মল সেই নূরানী চেহারাটি ভেসে উঠলো। খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ। বিদুষী মহিয়সী খাদীজা। জীবনের সুখ-দুঃখে ছিলেন চির সঙ্গীনী। পৃথিবীর বুকে সেই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলো। অঢেল সম্পদ আমার পদতলে লুটিয়ে দিয়েছিলো। হাঁ—সেই খাদীজারই এই মালাটি। সে এই মালাটি খুব পছন্দ করতো। মালাটিও তাঁকে দারুন মানাতো। কিন্তু খাদীজা তাঁর এই মালাটিও প্রিয় কন্যা যয়নবের বিয়েতে তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলো। ভাবতে ভাবতে রাসূল অনেক দূর চলে গেলেন। তিনি যেন কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। চেহারায় ক্ষীণ গভীর বেদনার রেখা ফুটে উঠলো। অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো তাঁর চোখ। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। বিজড়িত বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন, প্রিয় সাহাবীরা! শোন, আমার মেয়ে যয়নব তার স্বামীর মুক্তিপণের জন্য এই

মালাটি পাঠিয়েছে। তোমরা চাইলে বন্দীকে মুক্তি দিয়ে মালাটিও যয়নবের নিকট ফিরিয়ে দিতে পার।

সাহাবীরা শুরু থেকেই রাসূলের অস্বাভাবিক ভাবান্তর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছিলেন। বেদনা বিজড়িত রাসূলের চেহারায় অশ্রু ছল্ছল্ চোখ দু'টিও সাহাবীদের অগোচরে ছিলো না। তারা বুঝেছিলো, নিশ্চয় এই মালার পশ্চাতে রাসূলের এক মর্মস্পর্শী স্মৃতি ও বেদনাদায়ক ইতিহাস রয়েছে। তাই সাহাবীরা আর দেরী করলেন না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাই করুন। এটাই ভাল হবে।

এরপর রাসূল আবুল আসকে মুক্ত করে দিলেন। আর বলে দিলেন, সে যেন মক্কায় গিয়ে অনতিবিলম্বে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়।

আবুল আস তখন ইসলাম গ্রহণ না করলেও সে ছিলো অত্যন্ত চরিত্রবান। রাসূলের ঘোর দুর্দিনে মক্কার সর্দারদের অসহনীয় চাপ মুখ বুজে সহ্য করেছে। তবুও অকারণে স্ত্রী যয়নবকে তালাক দেয় নি। মদীনায় যুদ্ধবন্দী আবুল আস মুসলমানদের চরিত্রমাধুরীতে, আচার-আচরণে ছিলো দারুন মুগ্ধ। অত্যন্ত বিস্ময়াহত। আর রাসূলের সামনে ছিলো অত্যন্ত লজ্জিত। ভীষণ কুণ্ঠিত। তাই মক্কায় ফিরে এসেই রাসূলের কামনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিলো। যয়নব (রা)কে সব কথা জানিয়ে বললো, রাসূলের প্রেরিত লোকেরা তোমাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কার অদূরে অবস্থান করছে। সুতরাং আর দেরী নয়। শীঘ্রই তোমাকে যেতে হবে।

যাত্রার সব আয়োজন শেষ করে আবুল আস তার ভাই আমর ইবনে রবীয়কে দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। আমর ইবনে রবীয় মক্কার নামকরা বীর যোদ্ধা। সে জানতো, রাসূলের কন্যা যয়নবকে নিয়ে এই মুহূর্তে মক্কা ত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও সে ভয় পেলো না। কাঁধে ধনুক ঝুলিয়ে, পিঠে তূণীর বেধে নিলো। তারপর যয়নব (রা)কে হাওদায় তুলে দিনের আলোতেই কুরাইশদের নাকের ডগা দিয়ে রওনা দিলো।

আমর ইবনে রবীয়র স্পর্ধায় সবাই থ' বনে গেলো। একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। এ্যাঁ—আমর করে কি!? এতো বড় তার দুঃসাহস! সে কী তবে এতোই নির্ভীক! নিমিষে বায়ু তরঙ্গের সাথে সাথে সংবাদটি মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লো। আর দেরী নয়। সবাই

ছুটলো আমর ইবনে রবীয়ার পিছু পিছু। পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সবার এক কথা। আর এক পা অগ্রসর হতে দিবো না।

আমরের চোখে তখন লেলিহান অগ্নি শিখা। সংকল্পে কঠোর তাঁর চেহারা। তুনীরটি সামনে এনে ধনুকে তীর যোজনা করলো। তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে শাসিয়ে বললো, আল্লাহর কসম, আর এক পা কেউ অগ্রসর হলে আমার এই তীর তার কণ্ঠ ভেদ করে চলে যাবে। তার বজ্র হুঙ্কারে সবাই স্তব্ধ হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে গেলো। সবাই যেন নির্জীব। নিষ্প্রাণ। অসহায় ইঁদুরের ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি তাদের চোখের তারায় তারায়। হিংস্রতা আর বর্বরতায় ফুঁসে উঠা তাদের মনের বেলুনটি যেন হঠাৎ চুপসে গেলো।

আবূ সুফিয়ান। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। দারুন সচেতন। দূর থেকেই ব্যাপারটি আঁচ করলো। দ্রুত এগিয়ে এলো। আবেগ মিলিয়ে বললো, আরে ভাতিজা! কী হয়েছে? তীর ধনুক কেন? এসো, কথা বলেই দেখি কী হয়? তারপর ফিসফিস করে বললো, দেখ, ভাতিজা আমর! তুমি কিন্তু বুদ্ধির কাজ করো নি। এটা কেমন কথা? এখনো বদরের মৃতদের শোকে মক্কাবাসীদের চোখ শুকায় নি। অথচ তুমি সেই মুহাম্মদের কন্যাকে নিয়ে দিনের আলোয় সবার নাকের ডগা দিয়ে মদীনায় যাচ্ছ এটা তো সহজে মেনে নেয়া যায় না। এতে গোটা আরবের লোকেরা আমাদের নিন্দা করবে। তুমি বরং এক কাজ কর, ওকে নিয়ে এখন বাড়িতে ফিরে যাও। তারপর সবার অলক্ষ্যে মদীনায় পাঠিয়ে দিও।

বর্ষীয়ান আবূ সুফিয়ান। জ্ঞানের আধার। তার কথাটি আমর ইবনে রবীয়ার বেশ ভাল লাগলো। যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। তাই আর কোন উচ্চবাচ্য করলো না। বাড়িতে ফিরে এলো। এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পর রাসূল–তনয়া হযরত যয়নব (রা) নিরাপদে মদীনায় গিয়ে পৌছলেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ষষ্ঠ খণ্ড ঃ আবুল আস ইবনে রবীয় (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* ছুয়ারুম মিন সিয়ারিস সাহাবা, ৫৮৭ পৃষ্ঠা, দারু ইবনে হুজাইমা, রিয়াদ।

বীরাঙ্গনা সুফীয়া

ইতিহাসের সোনালী পাতাগুলো আজো উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বহু মুসলিম নারীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনীতে। জীবন দিয়েছেন, তবুও তারা ইসলাম ত্যাগ করেন নি। অনেকে যুদ্ধ করে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছেন। অনেকে আবার মুজাহিদদের হৃদয়ে জিহাদের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে বিজয় ত্বরান্বিত করেছেন। তবে সুফীয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা)এর বীরত্বের ধরনটাই ছিলো আলাদা। একেবারে অন্যধরনের। ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও পিছপা হতেন না। ভয় পেতেন না।

উহুদের যুদ্ধে অন্যান্য মুসলিম নারীর সাথে তিনিও রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের কাজ ছিলো দূর থেকে পানি বয়ে আনা। পিপাসার্ত মুজাহিদদের তা পান করানো। তীরের ফলা ধারানো। ধনুক ঠিক করে দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু সুফীয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা)এর অন্তরে আরেকটি কামনা, আরেকটি বাসনা ছিলো অত্যন্ত প্রবল। তা হলো অনতিদূর থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ভাই হামযা ও ছেলে যুবাইরের বীরত্ব, সাহসিকতা ও রণকৌশল দেখে আনন্দিত হওয়া। পুলকিত হওয়া।

করলেনও তাই। অনতিদূর থেকে রাসূল, স্বামী, ভাই ও ছেলেকে চোখে চোখে রাখছিলেন। তাদের বীরত্ব, রণকৌশল ও বজ্র হুঙ্কারে আনন্দিত ও পুলকিত হচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে গেছে। রাসূলের আশপাশে মাত্র কয়েকজন মুসলমান লড়াই করছে আর মুশরিকরা চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য রাসূলের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর সারা গায়ে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। মশক ছুড়ে ফেলে শার্দুল মাতার ন্যায় লাফিয়ে উঠলেন। নেজা হাতে ছুটতে ছুটতে ব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগলেন। কাফিরদের তাড়িয়ে, মুসলমানদের তিরস্কার করতে করতে এগুতে লাগলেন।

রাসূল তা দূর থেকে লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, ফুফু সুফীয়া রণক্ষেত্রে

ছুটে আসছে। ভয় পেলেন। হায়! সুফীয়া যদি তার ভাই হামযার বিকৃত লাশ দেখে। আহ্! তবে সে কি কাণ্ডই না করে বসে। রাসূল তাই যুবাইরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যুবাইর! শীঘ্রই যাও, থামাও তোমার মাকে। যুবাইর বিলম্ব না করে ছুটে গেলেন। বললেন, আম্মা! দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। আর এগুবেন না।

ঃ যাও ভাগো, আজ তোমার মা নেই।

ঃ আম্মা, রাসূল আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন।

ঃ কেন? এই কারণেই যে আমার ভাইকে বিকৃত করা হয়েছে। আরে ভয় নেই। এতো আল্লাহর পথে হয়েছে। এতে কোন দুশ্চিন্তা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুফীয়ার কথা শুনে বললেন, তাঁর পথ ছেড়ে দাও। যুদ্ধ শেষে সুফীয়া (রা) দেখলেন, তার ভাই হামযা (রা)এর পেট কেটে কলজে বের করা হয়েছে। নাক কান কেটে ফেলা হয়েছে। চেহারা হয়েছে বীভৎস, ভয়াবহ। দেখলেই শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু সুফীয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা) ব্যাকুল হলেন না, আত্মহারা হলেন না। অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল রইলেন। অত্যন্ত সংযমতার সাথে ইসতেগফার পাঠ করলেন। তারপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, হাঁ, আল্লাহর পথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এসব হয়েছে। আল্লাহর ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট। আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। আশা করি আল্লাহ তার বিনিময় দিবেন।

আর খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা তো আরো লোমহর্ষক। আরো বিস্ময়কর। মদীনায় হাস্‌সান ইবনে ছাবেত (রা)এর একটি মজবুত দুর্গ ছিলো। রাসূল যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তাঁর স্ত্রী পরিজন ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাদেরকে সেই দুর্গে রেখে গিয়েছিলেন।

যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে মুজাহিদরা সম্মুখ যুদ্ধে সারাক্ষণ ব্যস্ত রইলো। পরিবার পরিজনের সংবাদ নেয়াও তাদের সম্ভব হলো না। সুফীয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা) তখন দুর্গের চারদিকে পায়চারী করছিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখছিলেন। ঠিক তখন তাঁর দৃষ্টি একটি ছায়ামূর্তির উপর গিয়ে পড়লো। দুর্গের আশে পাশে সন্দেহজনক চলাফেরা করছে। ইতিউতি করছে।

সুফীয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা)এর অন্তরে একটি দুশ্চিন্তার

আভাস খেলে গেলো। তিনি আরো প্রখর দৃষ্টিতে ছায়ামূর্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বুঝলেন, ছায়ামূর্তিটি এক ইহুদী গুপ্তচর। দুর্গের অবস্থা জানতে এসেছে। যদি জানতে পারে যে, কোন মুজাহিদ নেই। কোন পুরুষ নেই। তাহলে অবিলম্বে তারা দুর্গ আক্রমণ করবে। পরিণতি হবে ভয়াবহ। তাছাড়া ইহুদীরা তো রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মক্কার কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়েছে। মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য গোপন আঁতাত করছে। তাই এই চরটিকে এখনই একটি উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার।

আর দেরী করলেন না। মাথায় চাদর বাঁধলেন। মজবুত করে কোমর বাধলেন। কাঁধে তুলে নিলেন কাঠের এক মস্ত বড় মুগুর। তারপর দুর্গের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খুলে মুগুর নিয়ে ঘাপটি মেরে রইলেন। চরটি ধীরে ধীরে দুর্গের দরজায় এলো। দরজা খোলা দেখে ভিতরে ঢুকতেই সুফীয়া (রা) তার মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন। চরটি মুগুরের আঘাতে টাল সামলাতে পারলো না। ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেলো। পরপর আরো কয়েকটি আঘাত করে তার জীবন লীলা সাঙ্গ করে দিলেন। তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে তার মুণ্ডুটি ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন এবং দুর্গের উপর থেকে তা সজোরে নিক্ষেপ করলেন। মুণ্ডুটি গড়াতে গড়াতে দুর্গের নীচে লুক্কাইত ইহুদী দলের সামনে গিয়ে পড়লো।

ইহুদীরা তাদের চরের অবস্থা দেখে ভয়ে কম্পমান। আক্রমণ তো দূরের কথা আতঙ্কে তাদের অন্তরাত্মা একেবারে চুপসে গেলো। তাড়া খাওয়া ইঁদুরের ন্যায় চুপে চুপে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালিয়ে জীবন বাঁচালো।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ষষ্ঠ খণ্ড ঃ ছুফীয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* হায়াতুস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ডঃ ২৮৪ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব আল আরাবী, লেবানন।

ক্ষুধার রাজ্য

দ্বিপ্রহর। চারদিকে গনগনে উত্তাপ। যেন আগুনের লকলকে হলকা মরু বাতাসের কোলে। গোটা প্রকৃতি অস্থির, ব্যাকুল। স্বস্তির সকল চিহ্ন যেন মুখ লুকিয়ে পালিয়েছে। সবাই ঘরে ঘরে বসে আছে। লু হাওয়ার ভয়ে কেউ বাইরে বেরুচ্ছে না।

আবূ বকর (রাঃ) তখন ক্ষুধায় অস্থির। সেই কখন নাম কা ওয়াস্তে কিছু খেয়েছিলেন তারপর থেকে পেটে দানাপানি কিছুই পড়ে নি। তাই জঠর জ্বালা শুরু হয়েছে। প্রথমে প্রথমে তিনি তেমন গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে এতো তীব্র জ্বলন সৃষ্টি করবে তা তিনি ধারণাও করতে পারেন নি। আর এখন তিনি অস্থির, বেকারার। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? এই প্রচণ্ড উত্তাপে কি কেউ বাইরে আছে? আনমনে পথ চলতে চলতে অবশেষে মসজিদে নববীর পথ ধরলেন।

উমর (রা) তখন মসজিদেই ছিলেন। তাঁরও ঐ একই অবস্থা। একই হাল। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনিও ইতিপূর্বে ঘর ছেড়ে মসজিদে নববীতে এসেছিলেন। বসে বসে চিন্তা করছিলেন। কি করবেন? কার কাছে যাবেন? এমন প্রচণ্ড ক্ষুধা আর তার এমন জ্বালা তিনি আর কখনো অনুভব করেন নি। ঠিক তখনই দূর থেকে আবূ বকর (রা)কে দেখলেন। পা দু'টি যেন টেনে টেনে তিনি আসছেন। খুব দুর্বল ও অস্থির মনে হচ্ছিলো তাঁকে। আরো কাছে এগিয়ে যখন একেবারে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় পৌছলেন, তখন উমর (রা) তাকে বললেন, এই গনগনে উত্তাপে ঘর ছেড়ে যে বাইরে এলেন?

আবূ বকর (রা) তখন মুখ তুলে তাকালেন। ভাবলেন, আহা! তোমারও তো একই অবস্থা হে উমর! তোমার উজ্জ্বল মুখের আগের সেই দীপ্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। ফ্যাকাশে পাণ্ডুর বর্ণ সেখানে আসন পেতেছে। উমর (রা)এর অবস্থা দেখে আবূ বকর (রা)এর হৃদয় গভীরে বেদনার এক তীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটলো। কিন্তু তিনি তা চেপে গেলেন। বললেন,

ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে মসজিদে এলাম।

ঃ আর আপনি হে উমর! এখানে কি করছেন? ঘর ছেড়ে যে মসজিদে?

ঃ আমারও ঐ একই অবস্থা। ক্ষুধার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মসজিদে নববীতে ছুটে এলাম। দেখি আল্লাহ কি করেন।

মসজিদে নববী সংলগ্ন খেজুর পাতার ছাউনী দেয়া রাসূলের নিবাস। ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। ইতিমধ্যে রাসূল সেই নিবাস থেকে বেরিয়ে এলেন। আবূ বকর (রা) আর উমর (রা) তো তাকে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। কি করবেন, কি বলবেন কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। ক্ষণকাল নিরবেই কেটে গেলো। তারপর রাসূলের মুখে মিষ্টি মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, এই প্রচণ্ড উত্তাপে মসজিদে কেন? কি হয়েছে?

এমনি একটি প্রশ্নের প্রতীক্ষায় তাঁদের হৃদয় আকুলি বিকুলি করছিলো। তাই প্রশ্ন শুনে একটু স্বস্তির শীতল বায়ু তাঁদের হৃদয়ে স্পর্শ করলেও বলার সংকোচ তাঁদেরকে স্থির করে ফেললো। তবুও জড়তা ভরা কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে বেরিয়ে এসেছি।

এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ভাবতে ভাবতে যেন ভাবনার সমুদ্রে হারিয়ে গেলেন। একটা বেদনার ছায়া ক্রমশ তাঁর মুখমণ্ডলে ওষ্ঠাধরে ছড়িয়ে পড়লো। কি করবেন? তিনি যে নিজেও ক্ষুধায় কাতর। ঘরেও খাবার নেই। এক ঘট দুধ বা দু' চারটি খেজুর থাকলেও হতো। নিজেও খেতেন। তাদেরকেও খেতে দিতেন। কিন্তু তাও নেই। ক্ষীণ একটি চিন্তার রেখা রাসূলের দীপ্ত চেহারায় ফুটে উঠলো। পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেলো। বাতাসে দোলায় কুসুমকলির ন্যায় রাসূলের শির দুলে উঠলো। বললেন, শোন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, ঠিক একই কারণে আমিও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। চল আমার সাথে।

রাসূল আবু বকর ও উমর (রা)কে নিয়ে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপে পথে নামলেন। কী করবেন? কোথায় যাবেন? হঠাৎ মন-মুকুরে আবু আইয়ূব আনসারী (রা)এর হাসি হাসি মুখটি ভেসে উঠলো। কতো ভাল

মানুষ! কতো উদার আর মহানুভব তার হৃদয়! মদীনায় এসে আল্লাহর হুকুমে তার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলাম। বড় মুহাব্বত করে আমাকে। বড় তাজীম করে। এবার রাসূলের চলার গতি বেগ পেলো। আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)এর বাড়ির দিকেই পথ ধরলেন।

রাসূলের আতিথেয়তা আর ভালবাসা আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)এর অস্থিমজ্জায় সাথে মিশে ছিলো। রক্ত কণিকার সাথে তা তাঁর সারা গায় ছুটে বেড়াতো। তাই প্রত্যেক দিন তিনি রাসূলের আতিথেয়তার জন্য ঘরে কিছু অতিরিক্ত সুস্বাদু খাবার রাখতেন। রাসূল নির্দিষ্ট সময়ে মাঝে মাঝে যেতেন এবং তা খেতেন। রাসূল না গেলে পরিবারের লোকেরা তা খেয়ে ফেলতো।

সেদিন রাসূল দরজায় পৌছতেই উম্মে আইয়ূব (রা) বেরিয়ে এলেন। রাসূলকে দেখেই এক খণ্ড প্রফুল্লতার আভা তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, শত স্বাগতম রাসূল ও তার সাথীদ্বয়কে। ভেতরে আসুন।

রাসূল বললেন, আবূ আইয়ূব কোথায়? তাকে যে দেখছি না। বাইরে কোথাও গেছে নাকি?

অদূরে আবূ আইয়ুব (রা) তখন একটি খেজুর গাছের পরিচর্যায় মগ্ন ছিলেন। বাতাসের পিঠে চড়ে রাসূলের কণ্ঠ তাঁর কানে পৌছলো। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আনন্দের আতিশয্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। স্বাগতম জানালেন রাসূল ও তাঁর সাথীদ্বয়কে। তারপর কিছুটা বিস্ময় ভাব প্রকাশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সাধারণত এ সময়ে আসেন না, তবে ...... । রাসূল বললেন, হাঁ তুমি সত্য বলেছো।

ইতিমধ্যে রাসূল ও তাঁর সাথীদ্বয়ের অবস্থা দেখে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)এর মন কেঁপে উঠলো। ছুটে তিনি বাইরে চলে গেলেন। সোজা খেজুর বাগানে গিয়ে হাজির। কাঁচা, পাকা আর আধ পাকা খেজুরে ঠাসা এক চমৎকার কাঁদি নিয়ে এলেন। চারদিকে একটা মিষ্টি মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে পড়লো। রাসূলের মনে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি হলো। তিনি বললেন, এতো খেজুর! এমন চমৎকার কাঁদিটি না কাটলেই তো হতো। শুধু পাকা খেজুরই যথেষ্ট ছিলো। আবূ আইয়ূব (রা)এর কণ্ঠ একেবারে

বিনীত। আবেগে টইটুম্বর। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মন বললো, আপনি সব ধরনের খেজুর খাবেন। তাই নিয়ে এলাম। তারপর চঞ্চল কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু বসুন, আমি বকরী যবাহ করছি। আবূ আইয়ূব (রা)এর ব্যগ্রতা রাসূলের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। তিনি বললেন, যদি যবাহ কর তবে দুধের বকরী যবাহ করো না।

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) চলে গেলেন। একটি বকরীর বাচ্চা যবাহ করে আনলেন। স্ত্রী উম্মে আইয়ূবকে বললেন, সুন্দর করে রুটি তৈরী কর। তারপর অর্ধেক গোশত দিয়ে তিনি তরকারী পাকালেন আর অর্ধেক ভুনা করলেন। খাবার প্রস্তুত। ভুনা গোশত, গোশতের তরকারী আর গরম রুটি। ভুর ভুর করে সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। রাসূল খাওয়া শুরু করলেই সবাই শুরু করবেন। ঠিক তখন কিছুক্ষণের জন্য রাসূল আনমনা হয়ে গেলেন। তন্ময় তন্ময় ভাব তাঁর চেহারার রেখায় রেখায় ফুটে উঠলো। হৃদয়পটে প্রিয় কন্যা ফাতেমার স্নিগ্ধ মায়াময় মুখটি ভেসে উঠলো। আহ্! ফাতেমাও তো কতো কষ্টে আছে। কতো দিন ধরে হয় তো এমন সুস্বাদু খাবার খায় নি। দেখেও নি। রাসূলের হৃদয় গলে গলে স্নেহের স্রোতধারা প্রবাহিত হলো। তিনি আর দেরী করলেন না। এক টুকরা গোশত তুলে নিয়ে একটি রুটিতে রাখলেন। তারপর আবূ আইয়ূব (রা)কে ডেকে বললেন, যাও, এখনি যাও। এ খাবারটুকু ফাতেমাকে দিয়ে এসো। কতো দিন থেকে সে হয় তো এমন খাবার খায় নি।

তারপর রাসূল খেতে শুরু করলেন। সবাই খেতে লাগলো। তৃপ্তি ভরে সবাই খেলো। খাবার শেষে রাসূল বললেন, রুটি, গোশত, পাকা-কাঁচা ও আধপাকা খেজুর। এতো খাবার! ভাবাবেগে রাসূলের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। অশ্রুমালার ভারে তাঁর দু'চোখ ছলছল করে উঠলো। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এগুলোই তো সেই নেয়ামত যা সম্পর্কে তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং এ ধরনের নেয়ামত খাওয়ার পূর্বে "বিসমিল্লাহ" বলবে, আর পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে "আলহামদু লিল্লাহ" বলবে।

মৌমাছির প্রহরা

মুসলমানদের অন্তর থেকে এখনো উহুদ যুদ্ধের ক্ষতটি শুকায় নি। হৃদয় দর্পনে এখনো ভেসে উঠে একের পর এক যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো। ঘোড়ার হ্রেষারব। তলোয়ারের ঝিলিক। আহতের চিৎকার। মুমূর্ষের গোঙানী। মন-মুকুরে এখনো ভেসে বেড়ায় দফের তালে তালে মুশরিক নারীদের গানের আওয়াজ—

إنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ وَنُفْرِشِ النَّمَارِقْ
أوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

যদি এগিয়ে যাও
করবো আলিঙ্গন
কোমল রেশমী তাকীয়া বিছিয়ে করবো সমাদর।
যদি পিছিয়ে যাও
করবো পরিত্যাগ
ভালবাসা আর মুহাব্বতের থাকবে নাকো রেশ।

ঠিক এমনি মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ'জন সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন। মক্কার খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে। আছের ইবনে ছাবেত (রা) তাদের আমীর। ছ'জনের এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলো। তারা যখন মক্কার অদূরে ঠিক তখন হুজাইল গোত্রের কিছু লোক তাদের দেখে ফেললো। আর রক্ষা নেই। মার্ মার্ কাট্ কাট্ করতে করতে তেড়ে এলো। চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। আছেম (রা) ও তার সঙ্গীরা এক টিলার চূড়ায় আশ্রয় নিলেন। আমরণ যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন।

হুজাইলের লোকেরা বললো, দেখ, তোমরা মাত্র ছ'জন। সংখ্যায় একেবারে নগণ্য। যুদ্ধে আমাদের সাথে পারবে না। আমরা তোমাদের

ক্ষতি করবো না। আত্মসমর্পণ কর। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এবার সাহাবীরা একে অপরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন। যেন দৃষ্টির বিনিময়ে তাঁরা পরামর্শ করছেন। ঠিক তখন আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর দৃঢ়কণ্ঠ ভেসে এলো। বললেন, আমি কিন্তু কোন কাফিরের প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করছি না। তারপর কোষমুক্ত তরবারী উঁচিয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করছি। লড়াই করছি। সুতরাং আমার শরীর আপনি হিফাজত করুন। কোন কাফির যেন আমার মৃতদেহের উপর যা ইচ্ছে তা করতে না পারে। তারপর হুজাইলীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আরো দু'জন সাহাবী তাঁর অনুগামী হলেন। তাঁরা তিনজন যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। আর বাকী তিনজন হুজাইলীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

হুজাইলীরা বদরের বীরযোদ্ধা, কাফিরদের ত্রাস হযরত আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর কথা অনেক শুনেছে। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতো না। তাই তারা তাঁকে চিহ্নিত করতে পারে নি। কিন্তু যখন শুনলো, নিহতদের একজন আছেম ইবনে ছাবেত তখন তাদের মনে আনন্দের বান বয়ে গেলো। বললো, বাহ্বা! দারুন মজা! এবার সুলাফা বিনতে সাআদ থেকে কিছু খসানো যাবে। এই আছেমই তার স্বামী আর তিন ছেলেকে হত্যা করেছিলো। তাই সে শপথ করেছে, "এই হত্যাকারীর খুলিতে সুরা পান করে মর্ম জ্বালা মিটাবে। আর যে তাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিবে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হবে।" তাই অর্থলোভে হুজাইলীদের জিহবায় এখন লালা ঝরে।

মক্কায় সংবাদ পৌছলে তাদের এক প্রতিনিধিদল বেশ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এলো। তারা আছেমের ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব দিলো। হুজাইলীরা এমন একটি প্রস্তাবের আশায় অধীর। তাই তাদের আনন্দের সীমা রইলো না। উল্লাসের অন্ত রইলো না।

তখনই ছুটলো আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর শির কেটে আনতে। কিন্তু আছেম (রা)এর লাশের অনতিদূরে পৌছুতেই তাদের চোখ

ছানাবড়া। বিস্ময়ে বিস্ফারিত। আশার গুড়ে বুঝি বালি। দেখলো, আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর লাশকে একদল মৌমাছি ঘিরে আছে। গুণ গুণ গুঞ্জন তুলে যেন মৌমাছির দল তাঁকে প্রহরা দিচ্ছে। কেউ একটু অগ্রসর হলেই গুঞ্জন তুলে দলে দলে ছুটে এসে হুল ফুটায়। কী ভয়ঙ্কর তাদের আক্রমণ! কী ভয়ঙ্কর তার জ্বালা! বারবার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হলো। তখন একজন বর্ষিয়ান বিজ্ঞের ন্যায় শির দুলিয়ে বললো, না, এখন আর নয়। রাতে মৌমাছিরা মৌচাকে চলে গেলে যা খুশী করা যাবে।

রাতের অপেক্ষায় তারা অধীর অপেক্ষমান। পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়েছে। ঝোপ ঝাড়গুলোতে পাখ-পাখালিরা কলকাকলিতে মেতে উঠেছে। রাতের হালকা আঁধার পাহাড়ের কোলে, বুনো ঝোপ-ঝাড়ে জমায়েত হতে শুরু করেছে। হুজাইলীদের প্রতীক্ষা এই তো শেষ হয় হয়। ঠিক তখনই ঘনকাল মেঘমালার আগমনে আকাশ ছেয়ে গেলো। ভয়াল অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিজলির চমকে চমকে হৃদয় কেঁপে উঠলো। ক্রুদ্ধ আকাশ ভীষন গর্জন শুরু করলো। তারপর শুরু হলো বর্ষণ। মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ চলতে লাগলো। উপত্যকা ভেসে গেলো। নিম্নভূমি তলিয়ে গেলো। পানিতে চারদিক থৈ থৈ করতে লাগলো। বৃদ্ধরা কখনো এমন বর্ষণ দেখে নি। এতো বৃষ্টি দেখে নি।

সকালের আকাশ স্বচ্ছ পরিষ্কার। একেবারে নীল চকচকে। কোথাও মেঘের কোন চিহ্ন নেই। ফকফকে কোমল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। হুজাইলীরা আবার আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর লাশের তালাশে বের হলো। কিন্তু নেই, নেই, নেই। কোথাও নেই। একেবারে লাপাত্তা। কোথায় গেছে তার লাশ কেউ বলতে পারে না।

সত্যই আল্লাহ আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর মনের আকুতি মঞ্জুর করেছিলেন। আর দু'আ কবুল করেছিলেন। তাই তাঁর মৃত দেহকে নিজ জিম্মাদারীতে হিফাজত করেছেন। মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যুগ যুগান্তরে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের এমনিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। রক্ষা করেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ষষ্ঠ খণ্ড ঃ আছেম ইবনে ছাবেত (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।

কুরআনের স্বাদ

আল্লাহর নবী। আল্লাহর রাসূল। দয়ায় মায়ায় ভরা তাঁর অন্তর। সহমর্মিতায় টইটুম্বর তাঁর হৃদয়। মানুষের জন্য তিনি কাঁদেন। অথচ মানুষ তাঁকে নির্মম নির্যাতন করে। মানুষকে তিনি চির শান্তির দিকে আহবান করেন। অথচ মানুষ তাঁকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গালাগালি করে। যেন তিনি অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য। আসলে এরা সত্যের দুশমন। আলোর শত্রু। এরা রাতের কুৎসিৎ পাখি বাদুর। অন্ধকার এদের দারুন প্রিয়। অন্ধকারেই এদের অহংকার। অন্ধকারেই এদের গর্ব। আলো এদের অসহ্য। এরা নর্দমার কীট। নর্দমায়ই এদের জীবন। নর্দমায়ই এদের মরণ।

তাই মদীনার নূরে নূরে ভরা শান্তির শহর এরা সহ্য করতে পারে না। মেনে নিতে পারে না। ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করে আসছে। কিন্তু আল্লাহর নূরকে কি ইবলিসরা ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে পারে? অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব! তাই ইবলিস ও তার দোসররা শত জ্বালায় জ্বলতে লাগলো।

হিজরী চতুর্থ বর্ষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে একটি সংবাদ পৌছলো। দারুন চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। আবার শান্ত মদীনার আকাশে অশান্তির আনাগোনা। কাক শকুনের আগমন। আবার যুদ্ধের ডঙ্কা। সশস্ত্র মদীনা আক্রমণের দূরভিসন্ধি। বনু মুহারিব ও বনু ছালাবার এতো ঔদ্ধত্য! এতো স্পর্ধা!

না, আক্রমণের পূর্বেই এদের প্রতিহত করতে হবে। এদের অহমিকা চূর্ণ করে দিতে হবে। এদের শক্তি ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। চার শ' যোদ্ধা সাহাবী নিয়ে রাসূল তীর তীব্রবেগে ছুটে চললেন বনু ছালাবা ও বনু মুহারিবের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথের যেন শেষ নেই। চলছেন তো চলছেন। প্রায় তিন শ' মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। ধূসর মরু। ছায়া মায়ার কোন চিহ্ন নেই। পাহাড়ের পর পাহাড়, টিলার পর টিলা অতিক্রম করে নুড়ি পাথরের দুর্গম পথে রাসূল ও

সাহাবীরা ছুটে চললেন। পাথরের আঘাতে আঘাতে সাহাবীদের পা ফেটে রক্তের ধারা ছুটলো। তাঁরা পায়ে পট্টি বাধলেন। আক্রান্ত সাহাবীরা খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছেন। তবুও চলার কোন বিরাম নেই। মরণ পণ এই সাহাবীদের নিয়ে অবশেষে রাসূল শত্রু এলাকায় গিয়ে পৌঁছলেন।

কিন্তু ফাঁকা। গোটা এলাকা একেবারে ফাঁকা। সমর আয়োজন তো দূরের কথা। মানুষেরই কোন চিহ্ন নেই। রাসূলের আগমন সংবাদে বীরত্বে ভরা তাদের হৃদয় ফোটা বেলুনের মত চুপসে গেলো। তাই ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে সবাই পালিয়েছে।

যুদ্ধ আর হলো না। তাই এবার ফেরার পালা। মদীনার পথে চলতে চলতে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা দু'টি দারুন অবাধ্য হতে শুরু করেছে। সামনে আর চলতে চায় না। শেষ রাতে রাসূল যাত্রা বিরতি করলেন। একটি উপত্যকায় এসে কাফেলা থামলো। সমবেত সাহাবীদের রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, প্রহরার দায়িত্বে আজ কে থাকবে? রাসূলের কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দু'জন সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। আব্বাদ ইবনে বিশর আর আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)। ব্যস! আর দেরী নয়। মুহূর্তের মধ্যে সবাই নিদ্রার কোলে গা এলিয়ে দিলেন। অনন্ত লোকে হারিয়ে গেলেন। গোটা উপত্যকা নিরব নিস্তব্ধ চাদরের অবরণে ঢাকা পড়ে গেলো। চাপ চাপ অন্ধকারের মাঝে কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু চারটি চোখ সেখানে অতন্ত্র প্রহরী। সে চোখগুলোতে নির্নিমেষ পলকহীন দৃষ্টি। সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। চোখগুলো সার্চ লাইটের মত চারদিক নিরীক্ষণ করছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে।

সহসা আব্বাদ (রা)এর মাথায় একটি চিন্তার মৃদু দোলা লাগলো। ভাবলেন, এই জনমানবহীন মরু পর্বতের পাদদেশে কে আসবে আক্রমণ করতে? তাই পালাক্রমে একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হবে। ক্লান্তি কেটে যাবে। পরামর্শের পর আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) পাশেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আর আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) সজাগ রইলেন।

অন্ধকার রাত। আকাশে তারকারাজির মুখে মিটি মিটি হাসি। দূরের তারাগুলো যেন পিটপিট চোখে তাকিয়ে ঘুমন্ত পৃথিবীকে দেখছে। এই

মায়াময় প্রকৃতিতে যেন গোটা পৃথিবী আল্লাহর স্তুতি গেয়ে ফিরছে। মহিমা ও পবিত্রতা পাঠ করছে। আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)এর মনটা কেমন জানি চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কোন এক অজানা রহস্যে তাঁর হৃদয় ক্রমেই অস্থির, বেচাইন হতে লাগলো। তিনি আর দেরী করতে পারলেন না। বিলম্ব করতে পারলেন না। নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহর স্তূতি আর প্রশংসা পাঠে নিমগ্ন হলেন। সূরা ফাতেহার পর সূরা কাহাফ তিলাওয়াত শুরু করলেন। সুললিত তাঁর কণ্ঠ। মিষ্টি মধুর তাঁর তিলাওয়াত। চলছে তো চলছে। বাতাসের বুকে শিহরণ জাগিয়ে তিনি তিলাওয়াত করেই চলছেন। বিরাম নেই সেই তিলাওয়াতের। শেষ নেই সেই স্বাদের। অন্ত নেই সেই মজার।

ইতিমধ্যে দূর থেকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক শত্রু সৈন্য এগিয়ে এলো। দেখলো, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো প্রহরী। দাঁড়িয়ে প্রহরা দিচ্ছে। তূনীরে তীর যোজনা করে তা নিক্ষেপ করলো। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। তীরটি সোজা এসে আব্বাদ (রা)এর গায়ে বিদ্ধ হলো। কিন্তু আব্বাদ (রা) নির্বিকার। স্থির। অবিচল। যেন তাঁর কিছুই হয় নি। শরীর থেকে তীরটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। আবার নামাযে মগ্ন হয়ে গেলেন। কুরআন তিলাওয়াতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। ঠিক তখনই শাঁ করে আরেকটি তীর উড়ে এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হলো। আশ্চর্য! এবারও সেই একই অবস্থা। একই হালত। আলতো টানে দেহ থেকে তীরটি তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার নামাযে নিমগ্ন হলেন। পরক্ষণেই শাঁ করে আরেকটি তীর তাঁর দিকে ছুটে এলো। এবার আব্বাদ (রা)এর টনক নড়লো। ভাবলেন, না, যেভাবে একটির পর একটি তীর আসছে তা উপেক্ষা করা যায় না। তাঁর দায়িত্ব প্রহরা দেয়া। আল্লাহ না করুন, যদি গোটা কাফেলা আক্রান্ত হয়। তাহলে.......। সাথে সাথে তাঁর শরীর শিউরে উঠলো। নামায ছেড়ে দিয়ে সঙ্গী প্রহরী আম্মার (রা)কে ডাকলেন।

এদিকে শত্রুসৈন্য একজনের জায়গায় দু'জনকে দেখেই অন্ধকারে পালিয়ে গেলো। সহসা আম্মার (রা)এর দৃষ্টি আব্বাদ (রা)এর গায়ে পড়লো। শিউরে উঠলেন তিনি। আরে! এতো রক্ত! রক্তে রক্তে দেখি

একেবারে ভিজে গেছো! 'আমাকে আগে জাগালে না কেন?' ভীষণ আপত্তি ভরা তাঁর কণ্ঠ। ভীষণ অভিযোগ ভরা তাঁর স্বর।

তবুও আব্বাদ (রা) নির্বিকার। একেবারে শান্ত। একেবারে গম্ভীর। অবশেষে তাঁর হৃদয় চিরে একটি গম্ভীর স্বর বেরিয়ে এলো। বললেন, নামাযে সূরা কাহাফ শুরু করেছিলাম। ভাবলাম, শত্রুর ভয়ে কি নামায ছেড়ে দেব? এটা কিভাবে হয়? অবশেষে একের পরে এক তীর আসতেই মনটা যেন দুর্বল হয়ে গেলো। দায়িত্বের চেতনাবোধ ফিরে এলো। তাই মনের সাথে লড়াইয়ে পরাজিত হলাম। শুন আম্মার, যদি প্রহরার দায়িত্বে অবহেলার ভয় না থাকতো, তবে জীবনের চেয়ে নামাযে সেই সূরাটি শেষ করাই আমার অধিক প্রিয় ছিলো। কিন্তু ভেবে চিন্তে দায়িত্বকেই প্রাধান্য দিতে হলো।

আব্বাদ (রা)এর কথা শুনে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) স্তব্ধ হয়ে গেলেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেলো তাঁর চিন্তাশক্তি। কাঠ হয়ে গেলো তার জিভ। কিছুই বলতে পারলেন না। শুধুমাত্র বিস্ময়ভরা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে আব্বাদ (রা)এর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুন্ম মিন হায়াতিস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড ঃ আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* রিজালুন হাওলার রাসূল, ৬০৮ পৃষ্ঠা, দারুল জীল, লেবানন।

সেই আবূযর

এই ক'দিন গেলো। খন্দকের যুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে। মদীনা এখন শান্ত। নির্বিঘ্নে যাচ্ছে তার দিনগুলো। টান টান সেই উত্তেজনা নেই। সেই অস্থিরতা নেই। ছন্দবদ্ধভাবেই দিনগুলো যাচ্ছে। ঠিক তখন দূর দিগন্ত থেকে একটি কাফেলার ছোট্ট চিহ্ন মদীনার দিকে এগিয়ে এলো। ছোট্ট কাফেলাটি ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করলো। উট, ঘোড়া আর পদব্রজে আসছে। মরুর ধুলি উড়ে উড়ে তাদের আগমনবার্তা মদীনার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলো।

প্রথমে যারা দূর থেকে দেখলো তাদের অন্তরে নানা প্রশ্নের উকিঝুকি দেখা দিলো। তবে কি এটাও মুশরিকদের নতুন যুদ্ধ কাফেলা? আবারও কি মুশরিকরা যুদ্ধের আয়োজন করেছে? কিন্তু এ ধরণের সন্দেহ ক্রমশ দূরীভূত হতে হতে একেবারেই হৃদয় থেকে মুছে গেলো। বিস্ময় আর হতবুদ্ধিতায় সবাই বিমূঢ়। কেউ তাদের চিনে না। কেউ তাদের দেখে নি। অথচ এরা মুসলমান! এতো দিন এরা কোথায় ছিলো? কোথায় ছিলো এদের নিবাস? কোন্ গোত্রের লোক এরা?

জানতে জানতে জানা গেলো এরা গিফার ও আসলাম গোত্রের লোক। কী গিফার! সবার চোখে মুখে চমক। সেই দুর্ধর্ষ! সেই লুটেরা! যাদের নাম শুনলেই বাণিজ্য কাফেলার হৃদয় এতোটুকুন হয়ে চুপসে যায়। ভয়ে ভয়ে থাকে। দূরে দূরে চলে। বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। আরো জানা গেলো, এদের নেতৃত্বে রয়েছে এক অসম সাহসী ব্যক্তিত্ব। যিনি সত্যের চির পিয়াসী। মিথ্যার ত্রাস। অত্যন্ত বাস্তববাদী ও আপোষহীন। নাম আবূযর গিফারী।

কাফেলাটি কোথাও থামলো না। সোজা মসজিদে নববীর দিকে চললো। সবাই ভিড় করে এদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে মসজিদে নববীর পথ বাতলে দেয়। মসজিদে নববীতে এসে কাফেলাটি যাত্রা বিরতি করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন। আনন্দ আর বিস্ময়ের আতিশয্যে ছুটে এলেন। সোজা বাইরে চলে এলেন। আরে, এতো বিশাল কাফেলা! নারী–পুরুষ, শিশু–যুবক–বৃদ্ধ নির্বিশেষে এরা সবাই কী মুসলমান! সত্যের সন্ধানী! আলোর অভিযাত্রী! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই এগিয়ে এলেন আবূযর গিফারী (রা)। রাসূলের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো। চার চোখের অপূর্ব মিলন ঘটলো। রাসূলের দৃষ্টি আবূযর (রা)এর চেহারায় স্থির হয়ে গেলো। তারপর তার প্রখরতা বাড়তে বাড়তে কাল পরিক্রমার বিপরীত দিকে ছুটে চললো। যেতে যেতে মক্কার সেই কঠিন দিনগুলোতে গিয়ে থামলো। ইসলাম তখন দারুন অসহায়। মাত্র চার কি পাঁচ জন মাত্র মুসলমান। মক্কায় তখন দারুন উত্তেজনা। সবাই মারমুখী। মুসলমান মাত্রই পৈশাচিক নির্যাতন, নিপীড়ন আর লাঞ্ছনার শিকার। ঠিক তখন একদিন গিফার গোত্রের এই আবূযর এলো। অত্যন্ত দৃপ্ত ও স্পষ্ট তার কণ্ঠ। বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার মতাদর্শের, আপনার ধর্মের কিছু বাণী শুনান। রাসূল কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শুনালেন। তা শুনে তো আবূযর আত্মহারা। সত্যের পরশে তাঁর হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ গোত্রের লোক। আবূযর গিফারী (রা) বললেন, গিফার গোত্রের লোক।

উত্তর শুনে রাসূলের ওষ্ঠাধরে মুগ্ধতার মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়লো। তারপর তা ধীরে ধীরে বিস্ময়তায় পরিণত হলো। বললেন, তুমি গিফার গোত্রের লোক? লুটতরাজ, হত্যা আর রাহাজানী যাদের দেহকোষের প্রতিটি অণুতে মিশে আছে, যাদের নাম শুনলে বাণিজ্য কাফেলার হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু করে কাঁপে, তুমি সেই গোত্রের লোক!

আবূযর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বিস্ময়াভিভূত হলেন। চোখ তুলে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর দোল খাওয়া কুসুমকলির ন্যায় রাসূলের ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠলো। বললেন, হাঁ, আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন।

আবূযর (রা)এর মন তখন অপূর্ব প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। সত্যের ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময়। ঈমানী বলে বলিয়ান। বাতিলের চির বিদ্রোহী। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন

আমার কি করতে হবে? রাসূল বললেন, তুমি এখন তোমার গোত্রে ফিরে যাও। ইসলামের বিজয় সংবাদ পেলে ফিরে এসো। কিন্তু আবূযর (রা)এর মন মেনে নিলো না। ভাবলেন, অন্ধকার আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই মানুষগুলোর মাঝে সত্যের ডঙ্কা বাজিয়ে তবে যাবো। সত্যের বাণী তাদের শুনিয়ে তবে যাবো। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সত্যই তিনি মসজিদে হারামে গিয়ে সমবেত কাফিরদের মাঝে উচ্চ কণ্ঠে কালিমা পাঠ করলেন। তাওহীদের ঘোষণা দিলেন। গোটা আরবের প্রাণকেন্দ্রে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দিলেন।

ইসলামী ইতিহাসে আবূযর গিফারী (রা)এর এই তাওহীদের ঘোষণা ছিলো প্রথম ঘোষণা। প্রথম আহবান। কুরাইশদের অহংকারে চপেটাঘাত করে কাবার দেয়ালে দেয়ালে তাওহীদের প্রতিধ্বনি উঠলো। স্তব্ধ হয়ে গেলো কাফির মুশরিকরা। মারমুখী হয়ে তেড়ে এলো। তারপর শুরু হলো নিপীড়ন আর নির্যাতন। মৃত্যুপ্রায় আবূযর (রা) কাবা চত্বরে পড়ে গেলেন। অবশেষে রাসূলের পিতৃব্য আব্বাস (রা)এর সহায়তায় তিনি রক্ষা পেলেন।

কিন্তু এতটুকুতেই কি আবূযর (রা) থেমে গেলেন। না, মোটেই না। তিনি এতো সহজে দমবার পাত্র নন। পরদিন তিনি আবার এই একই কাণ্ড করলেন। কাবা চত্বরে গিয়ে দেখেন দু'জন মহিলা ছাফা–মারওয়ার মূর্তি উসাফ আর নায়েলার তওয়াফ করে মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বিনয় নম্রভাবে মূর্তি দু'টির কাছে প্রার্থনা করছে। এ দৃশ্যটি আবূযর গিফারী (রা)এর প্রতিটি লোমকূপে আগুন ধরিয়ে দিলো। তিনি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেন। প্রবল বাধা দিলেন। তারপর তাওহীদের কালিমা উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন। সাথে সাথে আবার নেমে এলো সেই নির্মম নির্যাতন। অবশেষে নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গিফারী মুসলিম যুবকটির প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী মনোশক্তির কথা অনুধাবন করলেন। কিন্তু এখনো তো তার সময় আসে নি। পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। বাতিলের হিংস্র নখর থাবায় এখনো তারা অসহায় দুর্বল। তাই রাসূল তাকে আবারো একই নির্দেশ দিলেন। বললেন, আবূযর, তুমি তোমার কবিলায় ফিরে যাও। ইসলামের বিজয় সংবাদ পেলে তবে এসো।

সেই যে সেদিন আবূযর (রা) রাসূল থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন আর আসেন নি। রাসূলের সাথে আর দেখা হয় নি। মরু আরবের সুবিশাল কোলে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ তাঁকে চিনতো না। কেউ তাঁর কথা জানতো না। আর আজ তিনি রাসূলের দরবারে উপস্থিত। সাথে বিশাল এক সত্যের কাফেলা। হিদায়াতের আলোকমালায় উজ্জ্বল এদের মন। এরা ইসলামের সৈনিক। দুর্বার এদের মনোবল। দুর্দম এদের পদক্ষেপ।

সেই ভয়াল দুর্ধর্ষ গিফার গোত্র আজ কতো সুবোধ শান্ত। এরা এখন ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। রাসূলের মায়ামায়া দৃষ্টি গিফার গোত্রের দিকে সরে এলো। মুগ্ধতায় ভরে গেলো তাঁর চোখ দু'টি। তন্ময়তায় আত্মহারা হয়ে গেলো তাঁর হৃদয়। তারপর তির তির করে কেঁপে উঠলো তার চির সুন্দর ওষ্ঠাধর। বললেন, আল্লাহ গিফার গোত্রকে ক্ষমা করেছেন।

তারপর তাঁর মুগ্ধতায় ভরা দৃষ্টি ফিরে এলো আসলাম গোত্রের দিকে। এই আসলাম গোত্রও আবূযর (রা)এর শ্রমের ফসল। এদেরকেও সে সত্যের রাজপথে এনেছেন। হেরার জ্যোতির সন্ধান দিয়েছেন। এরাও আজ ইসলামের সৈনিক। হিদায়াতের নূরানী কাফেলার সহযাত্রী। আবেগে রাসূলের কণ্ঠ যেন হারিয়ে যেতে চায়। এরপর তিনি বললেন, আর আল্লাহ আসলাম গোত্রের সাথে নিরাপত্তার বন্ধনে আবদ্ধ।

এরপর সেই চির বিদ্রোহী, সেই অকুতোভয় মরণজয়ী আবূযরের দিকে রাসূলের দৃষ্টি ফিরে এলো। এক আকাশ মুগ্ধতা আর প্রশান্তি তাঁর চোখের তারায়। এক সমুদ্র উল্লাস আর আনন্দ তাঁর হৃদয়ে। তাই তিনি এখন অধীর। ক্ষণকাল এমনি কেটে গেলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠ চিরে এক শাশ্বত সত্য অমিয় বাণী বেরিয়ে এলো। তিনি বললেন, 'আবূযরের চেয়ে সত্যভাষী কাউকে পৃথিবী ধারণ করে নি। আকাশ ছায়া দেয় নি।

সত্যই আবূযর (রা) ছিলেন সত্যের আলোয় লালিত। সত্যের জন্য ছিলো তাঁর জীবন। সত্যের জন্য ছিলো তাঁর মরণ। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় সূর্য। চির বিদ্রোহী। আপোষহীন ব্যক্তিত্ব।

একটু সান্ত্বনার আশায়

স্বামীর কথা শুনে পুলকে নেচে উঠলো নবী–তনয়া ফাতিমা (রা)এর মন। ফুলের কুড়ির মতো এক অনুপম শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়লো তার চোখে–মুখে। বললেন, হ্যা, আজই যাবো আববুর কাছে। এতগুলো গোলাম বাদী থেকে একটি হলেই গৃহস্থালির কাজে খুব সহায়তা হবে। একটু নিস্তার পাবো বেহদ কষ্ট থেকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন ফাতিমা (রা)। স্বহস্তে যাঁতায় আটা পিষে রুটি তৈরী করতেন। যাঁতায় আটা পিষতে পিষতে হাতে ফোসকা পড়ে যেতো। গভীর কুয়ো থেকে পানি তুলে মশক ভরে তা বাড়ীতে বয়ে আনতেন। মশকের ভারে তার বুকে রশির দাগ পড়ে গিয়েছিলো। গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে লিপ্ত থাকার কারণে পরনের কাপড়–চোপড় প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন থাকতো। প্রাণপ্রিয় স্ত্রী নবী তনয়া ফাতিমা (রা)এর এ কষ্ট যাতনা আলী (রা)কে সর্বদা অস্থির করে রাখতো। ক্ষণিকের তরেও মনে একটু সান্ত্বনা পেতেন না। একটি বাদী কিনার বহু চেষ্টা করেছেন কিন্তু সম্ভব হয়নি।

সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অনেকগুলো গোলাম–বাদী এলো। আলী (রা) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, যাক্ একটা বাদী হলেই ফাতিমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর ফাতিমা (রা)কে পাঠালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একটি বাদী চেয়ে আনতে।

আলী (রা)এর পরামর্শে ফাতিমা (রা) খুব আনন্দিত হলেন। তাই সময় করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া ভরা মজলিসে এমন একটি কথা বলাও লজ্জাবতী ফাতিমা (রা)এর জন্য দারুণ

কষ্টদায়ক। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে এলেন। পরদিন আর ফাতিমা (রা)কে যেতে হলো না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে এলেন। বলি বলি করে কি যেন না বলেই ফাতিমা (রা) গতকাল এসেছিলো—তার খবর নিতে এলেন।

পিতার আগমনে ফাতিমা (রা) আনন্দিত হলেন। পরিস্কার স্থানে বসতে দিলেন। আলী (রা) বাড়িতেই ছিলেন। তিনিও এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মা! গতকাল কেন গিয়েছিলে? তোমার কোন খবর নিতে পারিনি।

লজ্জাবতী ফাতিমা (রা) লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না কিভাবে পিতার নিকট তাঁর প্রয়োজনের কথা তুলে ধরবেন। আলী (রা) ব্যাপারটি আঁচ করে ফেললেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাঁতা পিষতে পিষতে ফাতিমার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। কুয়োর পাড় থেকে পানি বয়ে আনতে আনতে বুকে রশির দাগ পড়ে গেছে। একা তার বড়ই কষ্ট হয়। তাই বলছিলাম, একটি বাদী নিয়ে আসতে। তা হলে একটু স্বস্তি পেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। দূর পাল্লার এক চাউনি ফেললেন। দূরে, বহু দূরে। ইহলোক ছাড়িয়ে পরলোক ঘুরে এলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তাকওয়া অর্জন কর। আল্লাহকে ভয় করে চল। তাঁর নির্দেশ মেনে চল। নিষ্ঠার সাথে গৃহের কাজ কর। আর মনে রেখো, ঘুমাবার পূর্বে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ, এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলা একটি বাদীর চেয়ে উত্তম।

সহায়তায় * হায়াতুস সাহাবা, চতুর্থ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব আল আরাবী, লেবানন।

আবূ হুরায়রার কান্না

'মা' মুখ গলিয়ে এই ছোট্ট শব্দটি বায়ু তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে যে কতো মধুর, কতো মিষ্টি লাগে তা বলার অবকাশ রাখে না। হাজার বার বললেও এই শব্দের মাধুর্য শেষ হয় না। আরো বলতে মনে চায়। আরো শুনতে মনে চায়। তাই মায়ের পদতলে কতো ছেলে তার জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। মায়ের সুখ চিন্তায় কতো সন্তান হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে নিপীড়ন, নির্যাতন ও বাধার বিন্ধাচল।

আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলের খিদমতেই দিনরাত কাটিয়ে দিতেন। রাসূলের মুখ নিঃসৃত মধুর বাণী শুনে আর রাসূলের স্বর্গীয় সুন্দর নিটোল চেহারায় আত্মহারা হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সকাল–সন্ধ্যা কাটিয়ে দিতেন। এই সুখে বিভোর সময়েও একটি প্রশ্ন বার বার হযরত আবূ হুরায়রা (রা)কে ব্যাকুল করে তুলতো। অস্থির করে ফেলতো। তাঁর মনের মাঝে একটি প্রশ্নের ধারালো কাটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতো। তিনি শিউরে উঠতেন। পরক্ষণেই নিশ্চল পাষাণের মতো স্থির হয়ে যেতো তাঁর শরীর। সারা মন জুড়ে ধিক্কার ধ্বনি বেজে চলতো। ছি, ছি, আবু হুরায়রা! এ জগতে তোমার স্ত্রী পরিজন কেউ নেই। শুধুমাত্র তোমার বৃদ্ধা মা বেঁচে আছেন। অথচ তিনি এখনো শিরকে অটল। আল্লাহ না করুন যদি এখন তিনি ইন্তেকাল করেন। তাহলে......

এরপর আর তাঁর চিন্তাশক্তি অগ্রসর হতে পারে না। থমকে দাঁড়ায়। আর আবূ হুরায়রা (রা)এর দু'চোখ ফেটে অশ্রুর ধারা নিরন্তর ঝরতে থাকে। তিনি কাঁদেন। শুধুই কাঁদেন। মনের আবেগে কান্নার গমকে থেকে থেকে তা তীব্র আকার ধারণ করে। তখন দু' হাত তুলে দয়াময় রহমান রহীম আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। অশ্রুর বন্যায় মনের বেদনা ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে গেলে তিনি মায়ের কাছে ছুটে যান। পাশে বসে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে তাকে ইসলামের বাণী শুনান। ঈমানের দাওয়াত দেন।

কিন্তু মা তাঁর দারুন অবিচল। কিছুতেই নড়ার পাত্র নন। ছেলের কোন কথাই শুনেন না। বরং বিরক্তির সাথে গালমন্দ করেন।

একদিন আবূ হুরায়রা (রা) অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে মায়ের নিকট গেলেন। হৃদয়ে তখন তাঁর অস্থিরতার ঝড়। মাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। অন্যান্য দিনের মতো আজো মা তাকে দারুন কঠিন কথা বললো। গালমন্দ করলো। ক্রোধের আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও দু'চার কথা বলে ফেললো।

এবার আবূ হুরায়রা (রা) আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। দু' চোখে অশ্রুর বান নেমে এলো। তখনই রাসূলের নিকট ফিরে এলেন। অঝোর ধারায় তাঁর চোখের অশ্রু ঝরে চলছে।

দূর থেকে রাসূল তাঁকে দেখলেন। আবূ হুরায়রার অবস্থা দেখে তাঁর অন্তরে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেলো। মনে অশুভ চিন্তার দাপাদাপি শুরু হলো। পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে এলেন। কণ্ঠে তাঁর অসীম সমবেদনা। বললেন, আরে আবূ হুরায়রা! কি হয়েছে তোমার? এতো কাঁদছো কেন? আবূ হুরায়রা (রা)এর অবস্থা তখন বেশামাল। জমাট বাধা এতো দিনের দুঃখ–বেদনা যেন চোখ ফেটে অশ্রুর আকারে বেরিয়ে আসছে। রোরুদ্ধ বিজড়িত তাঁর কণ্ঠ। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাতাকে প্রায়ই ইসলামের দাওয়াত দিতাম। ঈমানের কথা শুনাতাম। কিন্তু..... কিন্তু.... আজ তিনি আমাকে শুনিয়ে এমন কথা বললেন, যার পর আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একটু দু'আ করুন। আল্লাহ যেন আবূ হুরায়রার মায়ের অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মোচিত করে দেন।

আবূ হুরায়রা (রা)এর বেদনায় তখন রাসূল বেদনাপ্লুত। হৃদয় তাঁর চূর্ণ–বিচূর্ণ। গলে গলে যেন তা একেবারে বিগলিত হয়ে গেছে। তাই রাসূল তাঁর মায়ের জন্য দু'আ করলেন।

দু'আর পর আবূ হুরায়রা (রা)এর অন্তরে প্রশান্তির শীতল ঝির ঝিরে বায়ু যেন শীতলতার পরশ বুলিয়ে দিলো। রাসূলের দু'আ কবুল হয়েছে। আর চিন্তা নেই। এমন একটি বিশ্বাস, এমন একটি প্রত্যয় তাঁর অন্তরে

দৃঢ় ও মজবুত হয়ে আবার তাঁকে মায়ের নিকট ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করলো। তিনি আর বিলম্ব করলেন না। মায়ের নিকট ফিরে চললেন।

দরজায় করাঘাত করলেন। দরজা বন্ধ। পানি পড়ার ছলছলাৎ আওয়াজ শুনতে পেলেন। ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করতেই মায়ের কণ্ঠ ভেসে এলো। আবূ হুরায়রা! ভিতরে এসো না। একটু দাঁড়াও। গোছল সেরে কাপড় পরে বেরিয়ে এলেন আবূ হুরায়রা (রা)এর মা। তাঁকে ভিতরে ডাকলেন। ভিতরে প্রবেশ করেই আবু হুরায়রা (রা) দেখতে পেলেন মায়ের মুখ জুড়ে ছড়িয়ে আছে মিষ্টি মধুর হাসির ছটা। কী অপূর্ব তার শোভা! যেন ক্ষুদে ঘরটি তার আলোয় উদ্ভাসিত। তারপর তিনি কালিমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করলেন। আশ হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আবূ হুরায়রা (রা)এর অন্তরে তখন আনন্দের জোয়ার। খুশির বান। তিনি তখন দারুন উচ্ছসিত। অপরিসীম এই আনন্দ আর উচ্ছাসের সংবাদ দিতে তিনি আবার ছুটে এলেন রাসূলের দরবারে। চোখে মুখে তাঁর আনন্দের দ্যুতি। উচ্ছাসের আলো।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ আবূ হুরায়রা (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* রিজালুন হাওলার রাসূল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, দারুল জীল, লেবানন।

নিষ্কম্প ঈমান

হিজরী নবম বর্ষ। চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। মক্কা বিজয়ের পর মরু আরবে আর কোন বাধা রইলো না। দূর দূরান্তের কবীলাগুলোও মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করলো। রাসূলের বাইয়াত গ্রহণ করলো। এখন প্রতিনিয়ত ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত।

ঠিক এমনি মুহূর্তে মধ্য আরবের নজদ থেকে দু'জন লোক এলো। এরা দূত। রাসূলের নিকট এক্ গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বয়ে নিয়ে এসেছে। ফলে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের কোন অসুবিধা হলো না। সোজা রাসূলের মজলিসে চলে এলো। এক সাহাবী দূতের চিঠি পাঠ করে রাসূলকে শুনাচ্ছেন।

"আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট। পর সংবাদ, আপনার সাথে আমাকেও এ কাজে শরীক করা হয়েছে। সুতরাং যমীনের অর্ধেক আমার অন্য অর্ধেক কুরাইশের। তবে কুরাইশরা সীমালংঘনকারী ও বর্বর সম্প্রদায়।"

চিঠির প্রথম বাক্য শুনেই রাসূলের মুখমণ্ডলে এক মলিন ছায়া ছড়িয়ে পড়লো। গভীর বিমর্ষ ভাব তাঁর চেহারায়। আর কতো যুদ্ধ করবেন। আর কতো লড়াই করবেন। তিনি তো রহমতের নবী। শান্তির দূত। রক্তপাত তাঁর কাজ নয়। পৃথিবীর দিকে দিকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাজ। তাঁর উদ্দেশ্য। এ কাজে বাধা এলেই রাসূল বিমর্ষ মলিন হয়ে যান। এক সাগর চিন্তায় ডুবে যান। তাই রাসূল আজ দারুন চিন্তিত। অত্যন্ত বিমর্ষ।

রাসূল দূতদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। একটা কঠিন কঠিন ভাব তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠলো। বললেন, চিঠির বক্তব্যে তোমাদের মতামত কি? তারা বললো, তিনি যা লিখেছেন আমরা তাই বলি। বিশ্বাস করি। মুহূর্তে রাসূলের চেহারা আরো কঠিন হয়ে গেলো। কিন্তু

পরক্ষণেই আবার তা ধীরে ধীরে কোমল হতে লাগলো। কোমল হতে হতে একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আজ দূত না হলে তোমাদের শির ছিন্ন করে দিতাম। আর কিছু বললেন না। একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর চিঠির জওয়াব লিখে দিলেন—

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার নিকট। হিদায়াতের অনুসারীর উপর আল্লাহর শান্তি। আর যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানান। তবে অন্তিম শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"

শয়তানের দোসর মুসাইলামা। সে কি আর হিদায়াতের বাণী শুনে? রাসূল হওয়ার স্বাদ ভুলতে পারে? তাই সে তার কার্যক্রম বন্ধ করলো না। ফলে দিনে দিনে তার অনুসারীর দল বেড়েই চললো। মিথ্যা নবুয়তের বিষবৃক্ষের শিকড় দূরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এবার রাসূল আর নিরব থাকতে পারলেন না। ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। এর একটা বিহিত ব্যবস্থার চিন্তা করলেন। তাই শেষ বারের মত পত্র পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করে দেয়ার চিন্তা করলেন। কিন্তু কাকে পাঠাবেন? দূতিয়ালির এই দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য চাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তি। এমন কে আছে? রাসূলের চিন্তার ঘোড়াটি ছুটে চললো মদীনার ঘরে ঘরে। পল্লীতে পল্লীতে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পেলো।

হাঁ, সেই সুন্দর ভাবে এ দায়িত্ব আনজাম দিতে পারবে। যেমন সুদর্শন বুদ্ধিমান তেমন ঈমানী বলে বলিয়ান। ঠিক যেন মুমিনের জীবন্ত প্রতীক। বাস্তব নিদর্শন। হাবীব ইবনে জায়েদ। তাকেই পাঠাতে হবে।

রাসূলের চিঠি নিয়ে ছুটে চললেন হাবীব ইবনে জায়েদ (রা)। একা। সফরসঙ্গী তাঁর কেউ নেই। দুস্তর মরু কান্তার পাড়ি দিয়ে পাহাড় পর্বতের দুর্গম বাধা ডিঙ্গিয়ে তিনি নজদের বনু হানীফা গোত্রে গিয়ে পৌছলেন; তারপর সোজা চলে গেলেন মুসাইলামার নিকট। হাতে তাঁর রাসূলের চিঠি।

চিঠি পড়েই মুসাইলামার চেহারায় মরু ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিলো। হিংসা আর জিঘাংসার বিদ্যুৎ যেন বার বার চমকাচ্ছে সে চেহারায়।

ক্রোধে অধীর হয়ে অনুগত অনুচরদের চিৎকার দিয়ে বললো, যাও, একে বন্দী করে রাখ। আগামীকাল দরবারে নিয়ে আসবে।

মদীনার দূতকে বন্দী করা হয়েছে। আগামীকাল তার বিচার হবে। মুখে মুখে এ ছোট্ট সংবাদটি গোটা কবীলায় ছড়িয়ে পড়লো। শুধু কি তাই! বহু রংয়ের মিশ্রণ ঘটে সংবাদটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। কবীলার সবাই পরদিন সকালের প্রতীক্ষায় অধীর। নানা মুখে নানা জল্পনা কল্পনা। যেন এর শেষ নেই। শুরু নেই।

বিচার মজলিস। মুসাইলামা তার জমকালো কুরসীতে সমাসীন। দু'পাশে তার অন্ধ অনুচরের দল। দর্শক জনতার ভিড়ও প্রচুর। সবার মাঝে বন্দী হাবীব ইবনে জায়েদ (রা)। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু হাবীব ইবনে জায়েদ (রা) যেন সিংহ পুরুষ। তাঁর চোখে মুখে ভয় ভীতির কোন আভাস নেই। বীর দর্পে শৃঙ্খলিত হাবীব ইবনে জায়েদ (রা) সবার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। কথোপকথন করছেন।

মুসাইলামা ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

হাবীব ঃ হাঁ, আমি সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

মুসাইলামা ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমিও আল্লাহর রাসূল।

ব্যস, এ কথা শুনা মাত্র হাবীব ইবনে জায়েদ (রা)এর শরীরে আগুন ধরে গেলো। গর্দভ বলে কি? আস্ত পাগল নাকি? তারপর এক জ্বালাময়ী তিরস্কার আর বিদ্রূপের বাণ তাঁর কণ্ঠ চিরে ছুটে এলো। বললেন, তোমার ঐ নাপাক কথাগুলো রাখ। অন্য কিছু বল।

সাথে সাথে মুসাইলামার আনন্দ-উল্লাসে ভরা সহাস্য চেহারা কালো মলিন হয়ে গেলো। ক্রোধের তাপ তার সারা গায় ছড়িয়ে পড়লো। খিটমিট করে বললো, জল্লাদ কোথায়? তার শরীরের একটি অংগ এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেল। সাথে সাথে জল্লাদের এক আঘাতে হাবীব ইবনে জায়েদ (রা)এর শরীর থেকে একটি অংগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়লো, ধর ধর করে রক্তের ধারা নেমে এলো।

কিন্তু হাবীব ইবনে জায়েদ (রা) অনড় অবিচল। ইস্পাত কঠিন তাঁর ঈমান। সে ঈমানের নূরে জ্বল জ্বল করছে তাঁর নয়নতারা। মৃদু হাসির ঝলমলে রেখা লেগেই আছে তাঁর ঠোঁটের কোণে। যেন হেসে হেসেই তিরস্কার-বাণে জর্জরিত করছেন মুসাইলামার অন্তর।

আবার মুসাইলামা প্রশ্ন করলো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

ঃ হাঁ, আমি সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল।

ঃ আমি তো আগেই বলেছি, তোমার ঐ নাপাক কথাগুলো দূরে রাখ। অন্য কিছু বল।

মুসাইলামার শরীরে আগুন ধরে গেলো। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে আরেকটি অংগ কেটে ফেলার নির্দেশ দিলো। সাথে সাথে তরবারীর আঘাতে হাবীব ইবনে জায়েদ (রা)এর আরেকটি অংগ ছিটকে পড়লো। রক্তের ধারা বয়ে চলছে তাঁর শরীর থেকে। কিন্তু সে দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। কোন মনোযোগ নেই। শাহাদাতের অমিয় স্বাদে তিনি তখন বিভোর। হয়তো তার দৃষ্টি তখন জান্নাতের হুর গেলমান আর নিখাদ শান্তির সন্ধানে অস্থির, ব্যতিব্যস্ত।

এমনিভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চললো আর জল্লাদের তরবারীর আঘাতে হাবীব ইবনে জায়েদ (রা)এর একেকটি অংগ ধরার ধূলিতে ছিটকে পড়তে লাগলো। আর হাবীব ইবনে জায়েদ (রা) তাঁর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে দাঁড়িয়ে ইবলিস মুসাইলামার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। কিন্তু আর কতোক্ষণ? প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে নিস্তেজ হয়ে এলো তাঁর চোখের আলো। দুর্বল হয়ে গেলো তাঁর পা দু'টো। টলতে টলতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। স্থির হয়ে গেলো তাঁর জিহবা। চির স্থির হয়ে যেতে লাগলো তাঁর অঙ্গহীন দেহটি। এবার বিদায়ের পালা। বরং মহা মিলনের শুভযাত্রা। ছুটে চললেন তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের অভিসারে। ছুটে চললেন জান্নাতে সেই সুখদ শান্তির দেশে।

কিন্তু তখনো তাঁর ওষ্ঠাধর থেকে ক্ষীণ আওয়াজ উত্থিত হয়ে ঘোষণা করছিলো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড ঃ হাবীব ইবনে জায়েদ আনসারী (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* রিজালুন হাওলার রাসূল, ৫১৪ পৃষ্ঠা, দারুল জীল, লেবানন।

স্বপ্নের অছিয়ত

আবূ বকর (রা)এর খিলাফত কাল সবে মাত্র শুরু। মদীনার আকাশে মহা বিপর্যয়ের ঘনঘটা। মুসলমানদের দারুন সংকটময় কাল। আরবের চারদিকে বিদ্রোহের আগুন। ধর্মত্যাগের হিড়িক। মক্কা, মদীনা, তায়েফ এ ধরনের হাতে গোনা কয়েকটি কেন্দ্রীয় শহর ছাড়া গোটা ইসলামী জগত তখন টলটলায়মান।

ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কায্যাব সবার শীর্ষে। আরবের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার প্রভাব বলয়। লোকবল আর অস্ত্রবল কোনটারই অভাব নেই তার। আমীরুল মু'মিনীন আবূ বকর (রা) তার বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ এক মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। ছাবেত ইবনে কাইস (রা) সে বাহিনীর আনসারদের প্রধান আর ছালেম মাওলা আবূ হোজায়ফা (রা) মুহাজিরদের প্রধান। সবার শীর্ষে রয়েছেন হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা)। তিনি সেনাপতি।

যুদ্ধের শুরুতে বিজয় ও শক্তি ছিলো মুসায়লামার বাহিনীর পাশে পাশে। মুসলিম বাহিনী তখন ধীরে ধীরে পিছু হটছিলো। এক পর্যায়ে সেনাপতি খালেদ ইবনে অলীদ (রা)এর তাঁবু আক্রান্ত হলো। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো তাঁর তাঁবু। এমনকি তার স্ত্রী উম্মে তামীম (রা)ও নিহত হওয়ার উপক্রম হলেন। মুসলিম বাহিনীর অবস্থা তখন ভয়াবহ। যেন পরাজয় নেমে আসে আসে। অবস্থা দেখে হযরত ছাবেত ইবনে কাইস (রা) বেদনায় মুষড়ে পড়লেন। হৃদয়ে আক্ষেপের তোলপাড় শুরু হলো। হায় হায়!! এতো দ্রুত এই পরিবর্তন! কোথায় সেই জানবাজ মরণজয়ী মুজাহিদরা!! কোথায় সেই মরণ পিয়াসু মুসলিমরা!!

ছাবেত ইবনে কাইস (রা) কাউকে কিছু বললেন না। গায়ে সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। কাফনের কাপড় পরলেন। তারপর মুজাহিদদের মাঝে দাঁড়িয়ে অগ্নিঝরা কণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন। বললেন, মুজাহিদ ভাইয়েরা! শোন, গভীর মনোযোগ দিয়ে শোন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এভাবে যুদ্ধ করতাম না। শত্রুদের তোমরা দুঃসাহসী করে ফেলেছো আর নিজেরা অন্তঃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছো। তারপর তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! মুসাইলামা ও তার গোত্র যে শিরকে লিপ্ত আমি তা থেকে পানাহ চাই। আর এই মুজাহিদরা নিজেদের মাঝে যে অন্তঃদ্বন্দ্বে লিপ্ত আমি তা থেকেও পানাহ চাই। তারপর ক্ষুধিত শার্দূলের ন্যায় বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন। তাঁর দুর্ধর্ষ আক্রমণ দেখে মুসলিম শিবিরে আত্মমর্যাদা বোধ ফিরে এলো। এনেকেই তার সাথে ঝাপিয়ে পড়লো আর মুসায়লামার সৈন্যদের মাঝে ভয় ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। অবিরাম যুদ্ধ করতে করতে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। দেহের অসংখ্য জখমি থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়লেন। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ধরার ধূলিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চির শান্ত হয়ে গেলেন।

শহীদ সাহাবী ছাবেত ইবনে কাইস (রা)এর দেহে একটি মূল্যবান বর্ম ছিলো। এক নওমুসলিম তা দেখে লোভ সামলাতে পারলো না। বর্মটি খুলে লুকিয়ে রাখলো। ঠিক সে রাতেই এক সাহাবী তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। চেহারায় চিন্তার আভাষ। কণ্ঠে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। তিনি বলছেন, আমি ছাবেত ইবনে কাইস, আমাকে কি চিন?

ঃ হাঁ, চিনি।

ঃ তাহলে আমি তোমাকে একটি অছিয়ত করছি। সাবধান মনে করো না, এটা তো নিছক স্বপ্ন। এর আর তেমন কি গুরুত্ব। তাই বলছি, গুরুত্ব দিয়ে শুনো। আমি গতকাল শহীদ হলে আমার পাশ দিয়ে এক মুসলিম যাচ্ছিলো। আমার বর্মটি দেখে সে লোভ সামলাতে পারে নি। দেহ থেকে তা খুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। তারপর তিনি সেই সেই নওমুসলিমের বিবরণ বলে দিলেন। বললেন, মুসলিম সেনাবাহিনীর শেষ প্রান্তে অমুক দিকে তার তাঁবু। সে বর্মটি এক পাতিলের নীচে রেখে পাতিলের উপর কাজওয়া ফেলে রেখেছে।

সুতরাং তুমি সেনাপতি খালিদ (রা)এর নিকট গিয়ে তাঁকে বল, সে যেন কাউকে পাঠিয়ে বর্মটি নিয়ে আসে। এখনো তা সে স্থানেই আছে। তারপর বললেন, তোমাকে আমি আরেকটি অছিয়ত করছি। সাবধান! স্বপ্ন মনে করে কিন্তু তা ভুলে যেয়ো না। তুমি খালিদ ইবনে অলীদকে বলবে, যেন মদীনায় গিয়ে খলীফাকে বলেন, "ছাবেত ইবনে কাইসের জিম্মায় অমুক অমুক ব্যক্তির ঋণ আছে। আর তার অমুক অমুক গোলাম দু'টি এখন থেকে আযাদ। সুতরাং তিনি যেন ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং গোলাম দু'টিকে আযাদ করে দেন।"

ঘুম ভাঙ্গতেই লোকটির স্বপ্নের কথা স্মরণ হলো। সে একেবারে অস্থির হয়ে গেলো। একেবারে ব্যাকুল হয়ে গেলো। সাথে সাথে সেনাপতি খালিদ ইবনে অলীদ (রা)এর নিকট ছুটে গেলেন স্বপ্নের বৃত্তান্ত আগাগোড়া শোনালেন।

খালিদ ইবনে অলীদ (রা) ঠিক তখনই লোক পাঠিয়ে সে স্থান থেকে বর্মটি উদ্ধার করে আনলেন এবং মদীনায় ফিরে এসে হযরত আবূ বকর (রা)কে স্বপ্নের কথা বললেন। আবূ বকর (রা) তাঁর ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং গোলাম দু'টিকে ডেকে এনে তাদের আযাদ ও মুক্ত হওয়ার পয়গাম শুনিয়ে দিলেন।

ইসলামী ইতিহাসে এই স্বপ্নের অছিয়তটি সবাইকে বিমুগ্ধ করেছিলো। হতবুদ্ধি করেছিলো। স্বপ্নযোগে করলেও এই অছিয়তটি যথাযথ মর্যাদায় বাস্তবায়িত করা হয়েছিলো।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ ছাবেত ইবনে কাইস (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।

দুনিয়া যার শত্রু

শীতের রাত। প্রচণ্ড শীত। হাঁড়কাঁপানো কনকনে শীত। শীতের প্রচণ্ডতায় তাই কেউ বাইরে নেই। সবাই আশ্রয় নিয়েছে যার যার ঘরে। একটু উষ্ণতার আশায়, একটু উত্তাপের কামনায় তাই সবাই আকুল।

এই কঠিন কনকনে শীতের রাতে কয়েকজন মেহমান আবূ দারদা (রা)এর বাড়িতে এলো। আবূ দারদা (রা) তো মেহমান পেয়ে দারুন খুশি। আনন্দের যেন তাঁর শেষ নেই। মেহমানদের আদর আপ্যায়নের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন। গরম ধূমায়িত সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। পাশে বসে বসে যত্ন সহকারে খাওয়ালেন। সব কিছুই করলেন। কোন কিছুই বাদ পড়লো না।

কিন্তু বিছানায় যাওয়ার সময় হয়েছে সেই কখন। অথচ এখনো লেপ-কাঁথার কোন আয়োজন নেই। সেই যে তিনি অন্দরে গেলেন, বেরুবার কোন নাম নিশানাও নেই। মনের এই প্রশ্নটি সতেজ হতে হতে মেহমানদের মুখমণ্ডলের রেখায় রেখায় ফুটে উঠলো। তারপর জিভ আর স্থির থাকতে পারলো না। একজন বললো, আরে ভাই! কিছুই তো বুঝতে পারলাম না? এতো আদর আপ্যায়ন ; কিন্তু শোয়ার আয়োজন কোথায়? তিনি যে অন্দরে গেলেন আর যে বাইরে এলেন না। আরেকজন বললো, তাই তো! এই হাড় কাঁপানো শীতের রাতে কি এমনি ঘুম আসে? কি করা যায়? আরেকজন বললো, আরে ভাই! ভাববার কী আছে? আমি অন্দরে যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করে দেখি, কি হয়েছে?

একজন বারণ করলেও তার কথা কানে তুললো না। সোজা অন্দরে চলে গেলো। পায় পায় এগিয়ে গিয়ে সোজা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দরজা অর্গলমুক্ত একেবারে। খোলা। চকিতে তার দৃষ্টি একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়লো। সাথে সাথে বিস্ময়ে তিনি থ' বনে গেলেন। চোখ তার ছানাবড়া। দেখলেন, আবূ দারদা (রা) শুয়ে আছেন আর তাঁর স্ত্রী নিকটে বসে আছেন। গায়ে তাঁদের পাতলা একটি কাপড়।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর লোকটি বললো, আরে! আপনি তো দেখছি আমাদের মতই লেপ-কাঁথা ছাড়া রাত কাটাচ্ছেন। আপনাদের লেপ-কাঁথা কোথায়?

আবূ দারদা (রা)এর কণ্ঠ তখন দারুন শান্ত। একেবারে স্থির। কোন চঞ্চলতা নেই তাঁর কণ্ঠে। কোন তাড়া নেই তাঁর জিহবায়। বললেন, শোন, মন দিয়ে শোন। সেই পরলোকে আমাদের একটি ঘর আছে। আমরা যা উপার্জন করি সেখানে তা পাঠিয়ে দেই। তাই এই দুনিয়ার ঘরটি আসবাবশূন্য দেখছো। শোন, গরম কাপড় বা লেপ কাঁথা কিছু থাকলে অবশ্যই তা তোমাদের নিকট অনেক আগেই পৌছে দিতাম।

আবূ দারদা (রা)এর কথা শুনে লোকটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। নিরবে নতশিরে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে এলো।

আরেক দিনের ঘটনা। আবূ দারদা (রা) তখন শামে থাকেন। খলীফা উমর (রা) তাঁকে মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য শামে পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যে স্বয়ং খলীফা একদিন শামে এসে উপস্থিত হলেন। স্বচক্ষে তিনি শামের লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। তখন এক রাতে তিনি আবূ দারদা (রা)এর সাথে দেখা করতে এলেন। বাড়ির নিকটে পৌছে দেখেন, গোটা বাড়ি গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। আলোর কোন চিহ্ন নেই। নিরব নিস্তব্ধ। কিন্তু উমর (রা) থামলেন না। সোজা অন্দরে প্রবেশ করলেন। দরজা ধাক্কা দিলেন। আরে! একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন। দরজায় কোন অর্গল নেই। খোলা দরজা দিয়ে তিনি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন।

আবূ দারদা (রা)এর চোখে তখন ঘুম ছিলো না। খলীফা উমর (রা)এর আগমন অনুভব করেই লাফিয়ে উঠলেন। স্বাগত জানালেন। পাশে নিয়ে বসালেন। আলোর ব্যবস্থা করার কোন তাড়া নেই। যেন কোন প্রয়োজনও নেই। অন্ধকারে বসে বসেই কথা চলতে লাগলো। অনেক কথা। নিজেদের কথা। খিলাফতের কথা। বন্ধু-বান্ধবদের কথা। কথার যেন শেষ নেই। যেন ইতি নেই।

হঠাৎ উমর (রা)এর হাত আবূ দারদা (রা)এর বালিশে গিয়ে পড়লো। বিস্ময়ের বিদ্যুৎ যেন চমকে উঠলো তাঁর হৃদয়। আরে! এতো শক্ত! মনে হয় পশুর পিঠের গদি। তবে কি এটাই তাঁর বালিশ। তারপর

আরেকটু হাত চালালেন। কই লেপ কাঁথার তো কোন আলামতই দেখছি না। মাত্র পাতলা একটি চাদর। দামেস্কের এই প্রচণ্ড শীতে কি তা কোন কাজে আসে।

উমর (রা)এর হৃদয়ে এবার প্রচণ্ড কাঁপন লাগলো। ক্রমে তা তীব্র গতিতে তাঁর গায়ের দিকে ছুটে এলো। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। আবেগভরা তাঁর কণ্ঠ। সহানুভূতিতে ভরা তাঁর স্বর। বললেন, আবূ দারদা! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। তুমি বললে আমি কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করি। কিছু অর্থকড়ি পাঠিয়ে দেই।

উমর (রা)এর প্রস্তাব আবূ দারদা (রা)এর হৃদয়ে দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করলো। শিউরে উঠলো তাঁর মন। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়লেন। এখন যেন তিনি অন্য জগতের মানুষ। ভিন্ন লোকের মখলুক। কণ্ঠে তাঁর আকাশ সম বিস্ময়। বললেন, উমর! তোমার কি সেই হাদীসটির কথা স্মরণ নেই, যা রাসূল আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন।

ঃ কী সেই হাদীসটি?

ঃ রাসূল কি বলেন নি, মুসাফিরের পথের সম্বলের ন্যায় যেন তোমাদের দুনিয়ার সম্পদ হয়।

ঃ হাঁ, বলেছেন।

ঃ তাহলে রাসূলের পর আমরা এসব কী করছি? তুমিই বা আমাকে এসব কী বলছো?

এবার উমর (রা)এর হৃদয় কেঁপে উঠলো। রোরুদ্ধ একটি কান্না ছিটকে বেরিয়ে এলো। সেই সাথে চোখ ছেপে নেমে এলো অশ্রুধারা। উমর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আবু দারদা (রা)ও কাঁদতে লাগলেন। উভয়ের একই অবস্থা। একই হালত। অত্যন্ত করুণ তাঁদের কান্না। অত্যন্ত বেদনাদায়ক তাঁদের কান্না। এ কান্নার যেন শেষ নেই। যেন ইতি নেই। সোবহে সাদেকের আলোকমালা ফুটে উঠা পর্যন্ত তাঁরা কাঁদলেন। আকুল হয়ে কাঁদলেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ড ঃ আবূ দারদা (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* হায়াতুস সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ডঃ ৪৫৬ পৃষ্ঠা, দারুল কিতাব আল আরাবী, লেবানন।

কিসরার মুকুট

কালের চাকা থেমে নেই। ঘুরছে তো ঘুরছেই। অবিরাম তার গতি। বিরামহীন তার যাত্রা। এর মাঝে কতো ঘটনা, দুর্ঘটনা ঘটেছে। কতো ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। আবার তা কালের আবর্তেই হারিয়ে গেছে। সেই নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় মক্কার গুটি কয়েক মুসলমান। কতো করুণ ছিলো তাঁদের যাত্রা! অথচ মাত্র কয়েক দশক ঘুরতে না ঘুরতেই অর্ধজাহান তাঁদের পদানত হলো। গোটা বিশ্ব তাঁদের বজ্র হুংকারে থর থর কাঁপে।

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। ঝড়ের গতিতে মুজাহিদরা পারস্য সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছে। দুর্গের পর দুর্গ পদানত করছে আর পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন তাদের লক্ষ্য মাদায়েন। পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন। তিলোত্তমা নগরী মাদায়েন। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী নগরী মাদায়েন রীর তীব্রগতিতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে সেই মাদায়েনের দিকে। মাঝে মাঝে মদীনায় সংবাদ নিয়ে সামরিক ঘোড়া আসছে আবার মরুর ধুলি উড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে একদিন সেনাপতি সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)এর কয়েকজন দূত ধূলি উড়িয়ে মদীনায় এলো। তারা খুশীর সওগাত নিয়ে এসেছে। বিজয় সংবাদ নিয়ে এসেছে। রাজধানী মাদায়েন পতনের সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাদের পিছনে পিছনে এলো যুদ্ধলব্ধ প্রচুর সম্পদ। থরে থরে বোঝাই করা সম্পদ। যেন সম্পদের পাহাড়। খুলে যখন তা দেখা হলো তখন তো বিস্ময়ে সবার চক্ষু বিস্ফারিত। এতো সম্পদ!! এতো মণিমুক্তা জওহার!! ঐ তো মুক্তাখচিত কিসরার তাজ আর মহামূল্যবান মিহি স্বর্ণের সুতায় তৈরী তার পোষাক! ঐ তো অপূর্ব দুর্লভ পাথরে সজ্জিত তার আচকান! আরো কতো কি! এতো সম্পদ

দেখতে দেখতে যেন চোখ ক্লান্ত অবসন্ন।

এদিকে খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা)এর চেহারা তখন দারুন গম্ভীর। অত্যন্ত থমথমে। কোন বিকার নেই। কোন পরিবর্তন নেই। হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি সব উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর গম্ভীর অথচ মুগ্ধতায় ভরা কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয় যারা এই বিপুল সম্পদ বাইতুল মালে পৌছে দিয়েছে তাঁরা বিশ্বস্ত। উপস্থিত জনতার মাঝে হযরত আলী (রা) ছিলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়ার কারণে জনগণও নির্মোহ হয়ে পড়েছে।

এরপর হযরত উমর (রা)এর মাথায় এক আজব সখ চেপে বসলো। তিনি তা আর প্রতিহত করতে পারলেন না। উপস্থিত জনতার মাঝ থেকে সুরাকা ইবনে মালেক (রা)কে কাছে ডাকলেন। একেবারে কাছে নিয়ে এলেন। কারণ, তিনি ছিলেন সবার মাঝে সুঠাম, সুদর্শন ও মনকাড়া দেহের অধিকারী। তারপর নিজে তাঁকে কিসরার জামা, পায়জামা, আলখিল্লা ও মোজা পরালেন। কোমরে তার বেল্ট বেধে দিয়ে সম্রাটের তরবারীটি তাতে ঝুলিয়ে দিলেন। হাতে বাজুবন্দ ও মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন। দারুন দেখাচ্ছিলো তখন সুরাকা ইবনে মালেক (রা)কে। বিস্ময়ে অভিভূত সবাই। আনন্দে হতবুদ্ধি তাদের হৃদয়। সবার কণ্ঠ চিরে তখন আনন্দ ধ্বনি বেরিয়ে এলো। আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!!

এদিকে সুরাকা ইবনে মালেক (রা)এর মন কিন্তু এ মজলিসের আশে পাশে কোথাও নেই। ভাবনার দোলায় দুলতে দুলতে তাঁর মন বহুকাল পিছিয়ে এসেছে। মরু বিয়াবানের বালি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছে স্বীয় গোত্র বনু মাদ্লাযের বৈঠকখানায়। সেই কবেকার কথা। নানা আলোচনায় বৈঠকখানা তখন উত্তপ্ত। ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে মক্কার এক অশ্বারোহী দূত এসে বিরাট পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে গেলো। বলে গেলো, যে মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে।

একশ' উট!! হাঁ, একশ' উট। হতবাক হয়ে গেলো সুরাকা। স্থির হয়ে গেলো তার চিন্তাশক্তি। না, এ লোভনীয় পুরস্কার কিছুতেই হাতছাড়া

করা যায় না। মনের প্রতিজ্ঞা মনের মাঝেই লুকিয়ে রাখলো। বৈঠকখানা থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই আরেক লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। বললো, আরে !ঐ তো ঐ দিক দিয়ে একটি ক্ষুদে কাফেলা গেলো। মাত্র তিনজন আরোহী। হয়তো মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদ্বয়। লোকটির কথায় সুরাকা চমকে উঠলো। আরে ! শিকার তো হাতছাড়া হবার পালা। সাথে সাথে সবার লক্ষ্য অন্যদিকে ফেরানোর জন্য প্রতিবাদী কণ্ঠে বললো, আরে, না না। এরা অমুক কবীলার লোক। হারানো উট খুঁজতে বেরিয়েছে। কথায় ছেদ পড়তে লোকটি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলো। বললো, হয়তো তাই হবে।

তারপরও সুরাকা কিছুক্ষণ বৈঠকখানায় বসে রইলো। কারো মনে যেন কোন সংশয় সৃষ্টি না হয়। বৈঠকখানায় মক্কার পরিস্থিতি নিয়ে তখন আলোচনার খৈ ফুটছে। ঠিক তখন বিড়ালের ন্যায় পা টিপে টিপে সবার অলক্ষ্যে সুরাকা বেরিয়ে এলো। তারপর দে ছুট। সোজা বাড়িতে পৌঁছেই বাঁদীকে বললো, শোন, এক্ষুণি ঘোড়াটিয় জিন লাগাও। সবার অলক্ষ্যে সাবধানে পল্লির বাইরে ঐ উপত্যকায় বেঁধে আস। আর গোলামকে বললো, আমরা অস্ত্রগুলো বাড়ির পিছন দিক দিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পাশে রেখে আস। এদিকে সুরাকাও চুপি চুপি ঘোড়ার নিকট পৌঁছলো। বর্ম পরে তরবারী ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলো। কঠিন মরুর উত্তাপে লালিত সুরাকা যেমন যোদ্ধা তেমন সাহসী। ঘোড় সওয়ারীতেও সবার শীর্ষে। ঘোড়া ছুটালো সুরাকা। মরুর ধূলি উড়িয়ে ক্ষুদে কাফেলার লক্ষ্যে ছুটে চললো।

কাঁটা গুল্ম, ঝোঁপঝাড় আর টিলাগুলো পিছনে ফেলে সে হাওয়ায় ভেসে ছুটে চলছে। চলতে চলতে হঠাৎ তার ঘোড়াটি দারুন হোঁচট খেলো। ছিটকে পড়লো সুরাকা ঘোড়া থেকে। আরে ! একি কাণ্ড ! এমন তো কখনো হয়নি ! তবে কি যাত্রা অশুভ ! দুর ছাই, এগুলো কিছুই না। আবার সে ঘোড়ায় চেপে বসলো। ঘোড়াটি আবার ছুটে চললো। আবার ঠিক সেই একই কাণ্ড। ঘোড়াটি হোচট খাওয়ার সাথে সাথে সুরাকা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলো। মনের দুর্বল ধারণা এবার প্রবল আকার ধারণ

করলো। তবে ! তবে কী এ যাত্রা শুভ নয় ! কিন্তু একশ' উটের লোভ কি এতো সহজে ছাড়া যায় ! লোভের তাড়নায় অধীর সুরাকা আবার ঘোড়ায় চেপে বসলো। কিছু দূর অগ্রসর হতেই দেখতে পেলো ঈপ্সিত সেই ক্ষুদে কাফেলাটি। কাফেলার দৃশ্য আর একশ' উটের লোভ সুরাকাকে একেবারে ব্যাকুল করে ফেললো। আরো দ্রুত ছুটালো ঘোড়াটি। মাঝের ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। এখন কাফেলাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সুরাকা এবার একটি ছোট খাট সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধনুকে হাত বাড়ালো। কিন্তু একি ! হাত যে একেবারেই স্থির হয়ে গেছে। একেবারেই অবশ। প্রসারিত হয় না। নড়াচড়া করে না। হতবাক সুরাকা। তার সমস্ত চেতনা যেন দপ্ করে মুহূর্তে নিভে গেলো। দেখতে দেখতে ঘোড়ার সামনের পা দু'টি মাটির গভীরে দেবে গেলো। আর অনতিদূরেই মাটি ফুঁড়ে ধূয়ার কুণ্ডলি উঠতে উঠতে চোখমুখ সব অন্ধকার করে ফেললো। তারপর আবার তা কোথায় মিলিয়ে গেলো। ঘোড়ার পা দু'টি তুলতে সুরাকা আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু অসম্ভব। নিস্ফল তার সকল প্রয়াস। ফলে সুরাকার মনের দৃঢ়তা ভেঙে পড়লো। একশ' উটের প্রচণ্ড লোভ কিছুটা হ্রাস পেলো। অলৌকিক এসব ঘটনাগুলো তার মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।

ইতিমধ্যে সুরাকার সকরুণ আর্তনাদ ভেসে এলো। বললো, হে মুহাম্মদ ! আমার জন্য দু'আ করুন। আমার ঘোড়াটি যেন দাঁড়িয়ে যায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের থেকে শত্রুদের ফিরিয়ে রাখবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন। সাথে সাথে ঘোড়াটি লাফিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বিষাক্ত সাপের মতো সুরাকার মনের লোভ আবার ফোস্ করে ফন তুললো। সে আবার রাসূলের দিকে ঘোড়া ছুটালো। দু'চার কদম যেতে না যেতেই আবার ঐ একই কাণ্ড। ঘোড়ার সম্মুখ পা দু'টি মাটিতে দেবে গেলো। আক্রান্ত ঘোড়াটি অসহায়ের মত কাতর চোখে সুরাকার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো। বোবা প্রাণী যেন তার প্রভুকে নিষেধ করছে। বাধা দিচ্ছে। এবার সুরাকার লোভী মন একেবারে চুপসে গেলো। দারুন ভয় পেলো। তাই ভয়ার্ত কণ্ঠে

রাসূলকে ডেকে বললো। আমার অস্ত্র, পাথেয় সবকিছু আপনাকে দিলাম। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শত্রুদের আপনাদের থেকে ফিরিয়ে রাখবো। আমার জন্য একটু দো'আ করুন।

রাসূল অত্যন্ত উদার কণ্ঠে বললেন, দেখ, তোমার অস্ত্র আর পাথেয়ের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে শত্রুদেরকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে রাখবে। তারপর তিনি দু'আ করতেই তার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবার তার মনের বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, সত্যই তিনি আল্লাহর রাসূল। তাই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চিন্তে চলে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের আর কোন অকল্যাণ হবে না।

রাসূলের চেহারায় ফুলের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়লো। হেসে হেসে বললেন, বল সুরাকা! তুমি কি চাও? রাসূলের প্রশ্নে সুরাকার মন থমকে দাঁড়ালো। দারুন বিস্ময় ভাব ঝরে পড়লো তার কণ্ঠে। বললো, আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনার এ ধর্ম বিজয়ী হবে। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আমি যদি কখনো আপনার রাজ্যে ফিরে যাই আমাকে তখন সসম্মানে অবস্থান দিবেন। এর একটি প্রতিশ্রুতি বাণী লিখে দিলেই আমি মুগ্ধ। রাসূলের নির্দেশে আবূ বকর (রা) তাকে একটি প্রতিশ্রুতি বাণী লিখে দিলেন। তারপর সুরাকা যখন ফিরে যাবে যাবে ঠিক তখন রাসূল বললেন, সুরাকা! সেদিন কেমন মজার হবে, যেদিন তোমাকে পারস্য সম্রাট কিসরার বাজুবন্দ পরানো হবে। রাসূলের কথা শুনে সুরাকার চোখ বিস্ফারিত। একেবারে ছানাবড়া। বিস্ময়ভরা চোখে রাসূলের দিকে তাকিয়ে বললো, কিসরা ইবনে হরমুজের বাজুবন্দ!! রাসূলের কণ্ঠে অত্যন্ত প্রত্যয়ের সুর। বললেন, হাঁ, নিশ্চয় কিসরা ইবনে হরমুজের বাজুবন্দ।

মাত্র কিছুক্ষণ সময়েই সুরাকার মন সুদূর অতীত ঘুরে আবার মদীনায় সাহাবীদের সেই মজলিসে ফিরে এলো। হাঁ, রাসূলের সেই বাণীই তো আজ পূর্ণ হলো। বাস্তবায়িত হলো। আমার গায়ে এখন কিসরার জামা, পায়জামা আর আলখিল্লা। কোমরের বেল্টে তার তরবারী। আর হাতে তার বাজুবন্দ। সুরাকা ইবনে মালেক (রা) তখন গভীর তন্ময়তায় হারিয়ে

গেলেন। বারবার রাসূলের সেই বাণীটি তাঁর কানে গুঞ্জন তুলে তাঁকে অন্যমনস্ক করে ফেললো। হঠাৎ আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা)এর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে তাঁর চেতনা ফিরে এলো। তিনি বলছেন, বাহবা! কী চমৎকার! দেখ, বনু মাদলাজ গোত্রের এক বেদুইনের মাথায় কিসরার মুকুট আর হাতে তার বাজুবন্দ কেমন মানাচ্ছে! তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে দু'আ করলেন—

"হে আল্লাহ! আপনি আপনার রাসূলকে এ সম্পদ থেকে দূরে রেখেছেন। অথচ তিনি তো আপনার নিকট আমার চেয়ে অনেক প্রিয়, অনেক মর্যাদাবান ছিলেন। আবূ বকর (রা)কেও তা থেকে দূরে রেখেছেন। অথচ তিনিও আপনার নিকট আমার চেয়ে অনেক প্রিয়, অনেক মর্যাদাবান ছিলেন।

অথচ আপনি আমাকে তা দান করেছেন। সুতরাং আমি আপনার নিকট এ সম্পদের কঠিন পরীক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আশ্রয় চাচ্ছি।"

তারপর তিনি এই বিশাল সম্পদের স্তূপ মুসলমানদের মাঝে বন্টন শুরু করলেন। বন্টন করতে করতে একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সে মজলিস থেকে উঠলেন না।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ সুরাকা ইবনে মালেক (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।

আহওয়াযের দূত

আহওয়ায অভিমুখে ছুটে চলেছে এক বিশাল মুজাহিদ কাফেলা। পত্ পত্ করে উড়ছে ইসলামী পতাকা। চোখে মুখে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়। পদক্ষেপে বীরত্ব ও ক্ষিপ্রতা। তীর তীব্র তাঁদের গতি। আহওয়ায পদানত করতেই হবে। অন্যথায় যে কোন সময় বসরা শহর পারস্য শক্তির সামনে পদানত হতে বাধ্য। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই দারুন প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখে পড়লো। চড়াই উৎরাই যেন শেষ হয় না। উঁচু উঁচু পাহাড় পেরিয়ে দুর্দম গতিতে এগিয়ে চলছে। তদুপরি পদে পদে রয়েছে বিষধর সাপ আর বিষাক্ত বিচ্ছুর ভয়।

সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মুসলিম ফৌজ এগিয়ে চলছে। হতাশার কোন অশুভ ছায়া তাদের এখনো স্পর্শ করে নি। কারণ, সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা) অত্যন্ত দূরদর্শী। দারুন বিচক্ষণ। ক্লান্ত শ্রান্ত মুজাহিদদেরকে মাঝে মাঝে সমবেত করে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিতেন। ফলে তাঁদের শিরা উপশিরায় অনল প্রবাহ বয়ে যেতো। শরীরের সকল ক্লান্তি শ্রান্তি দূরীভূত হয়ে আবার আনন্দ–স্ফূর্তি, দৃঢ় বিশ্বাস ও আহওয়ায বিজয়ের নেশা তাঁদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো।

এভাবে চলতে চলতে তাঁরা আহওয়ায শহর প্রান্তে পৌছলেন। সেনাপতি শহরের অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। তারপর তাদের সামরিক করদানের আহবান জানালেন। তারা তাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করলো।ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লো। উভয় শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো।

শুরু হলো যুদ্ধ। ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুজাহিদরা যুদ্ধ করতে লাগলো। মরণপণ যুদ্ধ করতে লাগলো। অবশেষে আহওয়ায শহরের পতন হলো। দুর্গের শীর্ষে ইসলামী পতাকা উড়তে লাগলো।

যুদ্ধশেষে সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা) গণিমতের মাল বন্টন শুরু করলেন। প্রচুর সম্পদ। স্তূপে স্তূপে সম্পদ। মহামূল্যবান সম্পদ। বন্টন করতে করতে সহসা একটি অতিমূল্যবান অলংকার বেরিয়ে এলো। উজ্জ্বল ঝলমলে। দেখতে ভারি সুন্দর। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। উপস্থিত সবাই তা দেখে বিস্মিত। সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা) তা হাতে নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। বিস্ময়ের মোহ যেন তাঁর কাটে না। সহসা তাঁর মনে একটি চিন্তার আলো বিচ্ছুরিত হলো। এই মূল্যবান অলংকারটি যদি টুকরা টুকরা করে মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয় তবে এর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। বরং তা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)কে উপঢৌকন দেয়া যেতে পারে। চিন্তার সাথে সাথে চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। মৃদু হেসে মুজাহিদদেরকে তাঁর চিন্তার কথা খুলে বললেন। এমন চমৎকার প্রস্তাবের কি কেউ খেলাফ করতে পারে? সবাই হৃষ্টচিত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করলো।

সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা) তখন বনু আস্জা গোত্রের এক বুদ্ধিমান লোককে ডেকে বললেন, তুমি তোমার গোলামটি নিয়ে এক্ষুণি মদীনায় যাবে। আমীরুল মুমিনীনকে বিজয় সংবাদ পৌছাবে আর এই উপঢৌকনটি সবার হয়ে তাকে উপহার দিবে।

তারপরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর। একেবারে অবিশ্বাস্য। যা দেখলে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। হৃদয় আবেগাপ্লুত হয়। চিন্তা শক্তি খেই হারিয়ে ফেলে। তাই দূতের কণ্ঠেই আমরা এই বিস্ময়কর ঘটনাটি শুনবো। দূত বলেন, আমি তখন আমার গোলামকে নিয়ে বসরার বাজারে গেলাম। দু'টি বাহন কিনলাম। প্রয়োজনীয় পাথেয় কিনলাম এবং মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলাম। মদীনায় পৌছে আমীরুল মুমিনীনকে খুঁজে যখন পেলাম তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। লাঠি ভর দিয়ে হাঁটছেন আর সাধারণ মুসলমানদের খাবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর গোলাম ইয়ারফাকে বলছেন, ইয়ারফা! একে গোশত দাও। ওকে রুটি দাও। একে ঝোল দাও। আমি তাঁর নিকট পৌছলে তিনি হেসে বললেন, বস, কিছু খেয়ে নাও। আমি বসে

পড়লাম। তৃপ্তি সহকারে খেলাম।

খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হলে তিনি বাসায় রওনা দিলেন। আমি তাঁর পিছু নিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমি সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করেই দেখি তিনি এক টুকরা চামড়ার উপর বসে আছেন, আর খেজুরের ছালভরা বালিশে হেলান দিয়ে আছেন। ভীষণ ক্লান্তির পরও যেন তাঁর চোখেমুখে দারুন তৃপ্তি আর প্রশান্তির দ্যুতি লুকোচুরি খেলছে। তিনি আমাকে একটি চামড়ার বালিশ এগিয়ে দিলেন। বললেন, বস। তারপর পিছনে ফিরে বললেন, উম্মে কুলসুম! এই উম্মে কুলসুম! খাবার দাও। আমার মনে তখন দারুন অনুসন্ধিৎসু ভাব। চিন্তা করলাম, এবার দেখবো আমীরুল মুমিনীন নিজে কি খান আর সাধারণ মুসলমানদেরকে কি খাওয়ান।

ইতিমধ্যে উম্মে কুলসুম খাবার দিলেন। রুটি, যাইতুনের তৈল আর পাশে শক্ত লবণের একটি টুকরা। আমীরুল মুমিনীনের খাবার দেখে আমি বিস্ময়তায় ডুবে গেলাম। মনে বেদনার ঝড় বইলো। চোখের কোণে নিরবে অশ্রুর বিন্দু দেখা দিলো। তিনি বললেন, এসো আমার সাথেও কিছু খাও। আমি কি আর আমীরুল মুমিনীনের কথা লঙ্ঘন করতে পারি। নিরবে বসে গেলাম। কিছুটা খেলাম। দেখলাম, আমীরুল মুমিনীন অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে খেলেন। তারপর বললেন, পানি কোথায়? পানি নিয়ে এসো। যবের পানি ভরা একটি পাত্র নিয়ে এলো। তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, আগে মেহমানকে দাও। আমি বেশী পান করতে পারলাম না। কারণ, এর চেয়ে ভাল পানি আমার নিকট ছিলো। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন তা তৃপ্তির সাথে পান করলেন। তারপর বললেন, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনিই তৃপ্তির সাথে খাওয়ালেন ও পান করালেন।

তারপর আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একটি চিঠি নিয়ে এসেছি।

ঃ কার চিঠি?

ঃ সেনাপতি সালামা ইবনে কাইসের চিঠি।

ঃ সালামা ও তার দতকে স্বাগতম। মসলিম ফৌজের খবর কি?

ঃ আপনি যেমন চান তেমনি হয়েছে। বিজয় হয়েছে। তারপর আমি তাঁকে বিজয় কাহিনী শুনালাম। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন, তুমি কি বসরা হয়ে এসেছো?

ঃ হাঁ, বসরা হয়ে এসেছি।

ঃ মুসলমানরা সেখানে কেমন আছে?

ঃ ভাল আছে।

ঃ পণ্যের মূল্য কেমন?

ঃ অত্যন্ত সস্তা।

ঃ গোস্ত কেমন পাওয়া যায়? আর গোস্তই তো আরবদের প্রধান খাবার।

ঃ প্রচুর পাওয়া যায়।

তারপর আমার হাতের ছোট্ট সুন্দর কৌটার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আরে! তোমার হাতে ওটা আবার কি? আমি বললাম, বিজয়ের পর যখন সেনাপতি ছালামা ইবনে কাইস (রা) গণিমতের মাল বন্টন করছিলেন ঠিক তখন একটি অতি চমৎকার অলংকার পাওয়া গেলো। সেনাপতি তখন বললেন, এটা আমরা ভাগ করে নিলে এর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। আর সবাইকে দেয়াও সম্ভব নয়। তাই আমার মন চায়, আমরা সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে তা আমীরুল মুমিনীনকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে দেই। সেনাপতির এই প্রস্তাবে সবাই সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তাই সবার হয়ে আমি তা বয়ে নিয়ে এসেছি। এরপর আমি কৌটাটি তাঁর হাতে দিলাম।

তিনি কৌটাটি হাতে নিলেন। খুললেন। লাল, হলুদ, সবুজ রংয়ের উজ্জ্বল মূল্যবান পাথরগুলো বিস্ময়কর আলো ছড়িয়ে ঝিকমিক করতে লাগলো। কিন্তু তাতে তাঁর চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি নেই। মলিন মলিন তাঁর মুখ। হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। অলংকার সহ কৌটাটি মাটিতে ছুড়ে মারলেন। ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো তার টুকরা। তারপর আমার দিকে ফিরে অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন, যাও, সবগুলো টুকরা তুলে নাও। আর গোলাম ইয়ারফাকে বললেন, একে পিটাও। জোরে জোরে মারো। আমি তখন হতবুদ্ধিতার সীমানা পেরিয়ে একেবারে নির্বোধ। চিন্তা শক্তি আমার থেমে গেছে। ভয় পাওয়া শিশুর

মতো আমার হৃদয় কাঁপছে। ধড়ফড় করছে। আমি অলংকারের টুকরাগুলো একত্রিত করছি আর গোলাম ইয়ারফা আমাকে প্রহার করছে। তারপর তিনি বললেন, তুমি আর তোমার সাথী অত্যন্ত অশুভ। যাও, এক্ষুণি চলে যাও।

আমার অবস্থা তখন একেবারে কাহিল। ভয়ে হৃদয় দুরু দুরু করছে। তবুও অবশিষ্ট সাহসটুকু সঞ্চয় করে বিনয় বিজড়িত কণ্ঠে বললাম, আমীরুল মুমিনীন! কোন বাহনের ব্যবস্থা করে দিবেন কি? আমার বাহনটি আপনার গোলামের কাছে। তিনি তখন গোলামকে ডেকে বললেন, ইয়ারফা! ছদকার উট থেকে তাকে ও তার গোলামকে দু'টি উট দিয়ে দাও। আর আমাকে বললেন, শোন, উটের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তোমার চেয়ে বেশী মুহতাজ কাউকে দিয়ে দিবে। আবার তিনি আমার দিকে তাকালেন। যেন তাঁর দু'চোখ থেকে আগুন ঝরছে। আমি তখন ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেছি। বললেন, এই শোন, যদি এই অলংকার মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করার পূর্বেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে তোমাদের মজা দেখাবো।

আমি আর মুহূর্তকাল মদীনায় বিলম্ব করলাম না। আহওয়াযের পথে ছুটে চললাম। আহওয়াযে পৌছেই সেনাপতি সালামা ইবনে কাইস (রা)কে বললাম, আমাকে দূত বানানোর জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। শুনুন, আমার ও আপনার উপর মহা বিপর্যয় নেমে আসার পূর্বেই এই অলংকারটি মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দিন। তারপর তাঁকে ঘটনাটি বিস্তারিত বললাম। তিনি তখন একেবারে ভড়কে গেলেন। কালবিলম্ব না করে মুজাহিদদের সমবেত করলেন এবং তাদেরকে সেই অলংকারটি বিন্দু বিন্দু করে ভাগ করে দিলেন।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ সালামা ইবনে কাইস (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।

মা ও ছেলে

আসমা বিনতে আবূ বকর। নামটি একেবারে ছোট হলেও দারুন ঈর্ষণীয়। আরবের ক'টি মেয়ে তাঁর মতো এমন ভাগ্যবতী? শুধু তাঁর বংশ মর্যাদার কথাই বলি। তার পিতা আবুবকর (রা)। রাসূলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা। তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা)। তাঁর স্বামী রাসূলের প্রিয়তম সাহাবী যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা)। আর তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। এরা সবাই ছিলেন রাসূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অতি নিকটের। রাসূলের পাশে পাশে ছিলেন। দ্বীনের জন্য, রাসূলের জন্য তাঁরা ধনসম্পদ এমনকি জীবনও কুরবান করেছিলেন।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) ধীশক্তি আর উপস্থিত বুদ্ধিতে ছিলেন শীর্ষে। হিজরতের রাতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বকর (রা)এর বাড়িতে এলেন তখন আসমা (রা)এর আর তেমন কি বয়স! অথচ তিনি তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সবকিছুর আয়োজন করেছিলেন। প্রিয়নবী ও তার পিতার জন্য পানি, পাথেয় ও অন্যান্য সবকিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। এ দু'টো সাথেই দিতে হবে কিন্তু কি দিয়ে বেধে দিবেন? সাথে সাথে তিনি তাঁর কোমরের তাগা ছিড়ে দু' টুকরা করে পানির পাত্র ও পাথেয়ের পুটলি বেধে দিলেন। রাসূল তাঁর এই বুদ্ধিমত্তায় দারুন মুগ্ধ হয়ে দু'আ করলেন, আল্লাহ যেন তাঁকে এর পরিবর্তে জান্নাতে দু'টি তাগা দান করেন।

প্রিয় নবী ও পিতার হিজরতের পর আসমা (রা) দারুন অস্থির হয়ে পড়লেন। দুনিয়ার সবকিছু তাঁর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেলো। মদীনায় হিজরতের চিন্তা তাঁর মন-মননকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তিনি তখন গর্ভবতী। অন্তঃসত্ত্বা। মদীনার মরুপথ দুর্গম, ভয়াবহ। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে দ্বীন ও ঈমান নিয়ে তিনি মদীনায় যাত্রা করলেন। অবর্ণনীয়

কষ্ট, যাতনা ও দুর্ভোগ সহ্য করে যখন তিনি মদীনার কোবা পল্লীতে পৌছলেন ঠিক তখনই তার নয়নের মনি, হৃদয়ের ধন আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করলেন।

মুহাজির মুসলমানরা এতে দারুন খুশি হলেন। অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। রাসূলের কোলে যখন ফুটফুটে শিশু আবদুল্লাহকে দেয়া হলো তখন প্রফুল্লতার এক স্নিগ্ধ আভা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠলো। তিনি তাঁর থুথু শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিলেন। রাসূলের এই পবিত্র থুথুই ছিলো শিশু আবদুল্লাহর প্রথম খাদ্য। তাই এই ভাগ্যবতী মাতা আসমা (রা)এর ন্যায় পুত্র আবদুল্লাহও ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। কিন্তু এই আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)এর শাহাদাতের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ। দারুন হৃদয় বিদারক। আর তাঁর মায়ের ধৈর্যের কাহিনী আরো হৃদয় বিদারক। আরো মর্মন্তুদ। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রহ)এর ইনতেকালের পর প্রায় গোটা ইসলামী জগত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)এর বাইয়াত গ্রহণ করলো। হিজাজ, মিশর, ইরাক, খোরাসান এমনকি সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা তার খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো।

কিন্তু বনু উমাইয়া দারুন ধুরন্ধর। অসম্ভব কূটনীতিবাজ। নানা কূটকৌশলে তারা তার খিলাফতের সীমানা সংকুচিত করতে করতে সবশেষে এক বিশাল বাহিনী মক্কায় প্রেরণ করলো। এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। সিরীয় বাহিনী মক্কা আক্রমণ করলো। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তখন বাইতুল্লাহয় আশ্রয় নিলেন। সিরীয় বাহিনী প্রবলবেগে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করলো। তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে ক্বাবার দেয়াল ফেটে পড়তে লাগলো। দীর্ঘ অবরোধের কারণে মক্কা নগরীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ক্ষুধাতুর মানুষের ক্রন্দন রোল উঠলো। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)এর বহু সৈন্য অনাহারে কাতর হয়ে ধীরে ধীরে পালিয়ে হাজ্জাজের সৈন্য শিবিরে মিলিত হতে লাগলো। এমনকি তাঁর দু' সন্তান হাবীব ও হামযাও হাজ্জাজের বাহিনীতে মিলিত হলো। পরিস্থিতি যখন চারদিক থেকে অন্ধকার হয়ে এলো, আলোর কোন ছটা আর বাকী রইলো না তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)এর

মায়ের কথা মনে পড়লো। হাঁ, এই চরম মুহূর্তে বুদ্ধিমতী মায়ের পরামর্শ নেয়া দরকার।

ছুটে গেলেন মায়ের কাছে। ছালাম বিনিময়ের পর মা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন, এই কঠিন মুহূর্তে তুমি এখানে। দেখছো না শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে হারামের দেয়াল থর থর করে কাঁপছে। ইবনে যুবাইর (রা) অস্থির কণ্ঠে বললেন, হাঁ, মা! তবে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)এর বয়স তখন একশ'র অধিক। জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে করতে তিনি এই বয়সে পৌছেছেন। হয়তো চরম আঘাতের প্রতীক্ষায় মানসিক প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। তাই আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, কিসের পরামর্শ?

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) তখন অসহায় কণ্ঠে বললেন, আম্মা! হাজ্জাজের ভয়ে ও তার সম্পদের আশায় আমার সঙ্গীসাথী এমনকি আমার দু' ছেলেও তার শিবিরে পৌছেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ আমার সাথে যুদ্ধ করছে। কিছুক্ষণ পর তারাও লুটিয়ে পড়বে। এদিকে বনু উমাইয়ার দূতরা আমাকে দুনিয়ার সবকিছু দিতে প্রস্তুত। তবে শর্ত একটি। অস্ত্র ছেড়ে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় আমার কি করণীয়?

আবেগের তন্ময়তা থেকে আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)এর কণ্ঠ তখন ধীরে ধীরে দৃঢ় ও কঠিন হতে লাগলো। বললেন, প্রিয় বৎস! প্রকৃত অবস্থা তুমিই ভাল জান। তবে তুমি যদি বিশ্বাস কর যে, তুমি সত্যে অবিচল আছ এবং চির সত্যের দিকেই ধাবিত হচ্ছো তবে ধৈর্য ধর। তোমার অন্যান্য সাথীরা যেভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছে ঠিক তেমনি বীরত্বের সাথে তুমিও যুদ্ধ করতে থাক। আর যদি তুমি দুনিয়ার মোহে এ যুদ্ধ করে থাক তবে শুনে নাও, তুমি এ ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রাণী। নিজেও ধ্বংস হয়েছো। অন্যদের ধ্বংস করেছো।

ঃ (আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের হতাশ কণ্ঠ) কিন্তু আমি তো মা আজ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিতে যাচ্ছি!

ঃ আত্মসমর্পণের চেয়ে তা অনেক ভাল। অন্যথায় বনু উমাইয়ার অর্বাচীন ছেলেরা তোমার ছিন্ন মস্তক নিয়ে আমোদ ফুর্তি করবে।

ঃ নিহত হওয়াকে আমি ভয় করি না। তবে আমার দেহ যদি বিকৃত করা হয়। এ চিন্তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমাকে অস্থির করে ফেলছে।

ঃ আহ্, এতে আবার ভাবনার কি আছে। ছাগল যবাহ করার পর তার চামড়া তুলে নিলে কি ছাগলের কষ্ট হয়?

মায়ের কথায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)এর চেহারায় এক স্বর্গীয় দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো। আনন্দের আতিশয্যে মায়ের ললাট চুম্বন করে বললেন, আম্মা! এমন উপদেশের জন্যই তো আপনার নিকট এসেছি। আল্লার কসম, আমি দুর্বল হই নি। ভেঙে পড়ি নি। আমি যা করেছি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি। দুনিয়ার লোভে নয়। আমি এখন শাহাদাতের তামান্নায় রণাঙ্গনে যাচ্ছি। আমি শহীদ হলে আপনি ব্যথিত হবেন না। দুঃখিত হবেন না।

ঃ আমি দুঃখিত হতাম, যদি তুমি বাতিলের পক্ষে জীবন দিতে। আল্লাহর লাখ শুকরিয়া তিনি তোমাকে ও আমাকে একই মতাদর্শ, একই মন-মানসিকতায় তৈরী করেছেন।

এরপর আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, এসো, আমার কাছে এসো। শেষ বারের মতো আমি তোমার ঘ্রাণ নেই। তোমাকে স্পর্শ করি। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) তখন মায়ের দিকে ঝুকে এলেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) তখন তাঁর মাথায়, কাঁধে ও চেহারায় নাক স্পর্শ করে প্রাণভরে তাঁর ঘ্রাণ নিলেন। তাঁকে চুমু খেলেন। তারপর সারা দেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর হাত বর্মে গিয়ে পড়লো।

ঃ আরে আবদুল্লাহ! তুমি এটা কি পরেছো?

ঃ না আম্মা! ওটা কিছু না, সামান্য বর্ম।

ঃ যে শাহাদাতের তামান্না করে তার জন্য এটা শোভনীয় নয়।

ঃ আম্মা! আপনার উদ্বেগহীনতা ও স্থিরতার জন্য পরেছি।

ঃ না, না, এটা খুলে ফেল। বর্মহীন দেহ অত্যন্ত হালকা। বীরত্বে প্রচণ্ড। অস্বাভাবিক ক্ষীপ্র। তবে তার পরিবর্তে লম্বা সেলোয়ার পরে নাও। শাহাদাতের পর তা তোমার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ম খুলে সেলোয়ার পরলেন। তারপর মায়ের নিকট দুয়া প্রার্থনা করলেন। তখন আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! নিশি রাতে যখন মানুষ আয়েশী ঘুমে অচেতন থাকতো সে সময়ের তাঁর নামায ও রোনাজারিকে আপনি কবুল করুন। মক্কা ও মদীনার প্রচণ্ড উত্তাপে রোজা অবস্থায় তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে আপনি কবুল করুন। পিতামাতার প্রতি তাঁর অসীম আনুগত্যকে আপনি কবুল করুন।

হে আল্লাহ! আমি তাকে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম। আপনার ফয়সালাতেই আমি সন্তুষ্ট। সুতরাং তাকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দান করুন। ধৈর্যশীলদের কাতারে তাকে শামিল করুন।

তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাসের সোনালী পাতা আজো তাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধগাঁথা বর্ণনা করে গর্ববোধ করে। যুগের বীর সন্তানদের দিক নির্দেশনা দান করে।

শাহাদাতের পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তার শির ছিন্ন করে আবদুল মালেকের নিকট প্রেরণ করে ও তাঁর দেহ মক্কার বাইরে এক উচু স্থানে ঝুলিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ মাতা এই হৃদয়বিদারক সংবাদ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা কাগজ কলম ব্যক্ত করতে আজো পারে নি। পারবেও না। তবে ইতিহাস বলে, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর ছেলের লাশ দাফন করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন ; কিন্তু পাষাণ হৃদয় হাজ্জাজ বলেছিলো, আমি এই দৃশ্য স্থায়ী করতে চাই।

কুরাইশের কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ ও আপামর জনতা পথ চলতে চলতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে নিরবে অশ্রু ফেলে চলে যেতো।

একবার আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) এ পথে যাওয়ার সময় প্রাণপ্রিয় পুত্রের লাশের দিকে দীর্ঘক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। হৃদয়ের কান্নার ঝড়কে হৃদয়েই বহু কষ্টে দাফন করে শুধুমাত্র কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন, এখনো কি এই বীর যোদ্ধার অশ্ব থেকে নেমে আসার সময় হয়নি। তারপর চোখ ফেটে হৃদয়ের বেদনা নিয়ে দু' ফোটা তপ্ত অশ্রু মরুর বালিতে গড়িয়ে পড়েছিলো।

সহায়তায় * ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ঃ আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)এর জীবনী, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
* জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ; অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান।

সমাপ্ত